সুখীজীবন ও কাজের সন্ধানে

ডেল কার্নেগি

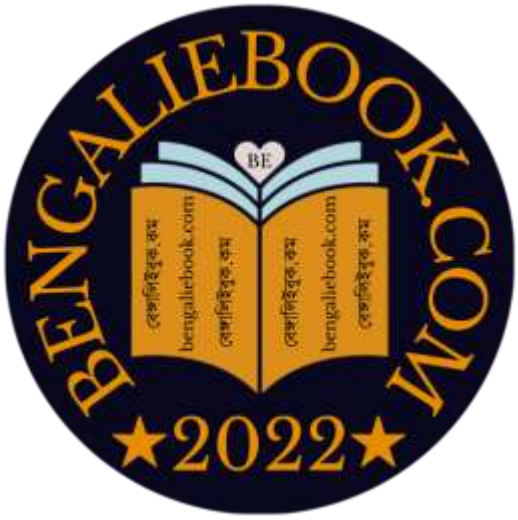

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ-কথা.....3

১. বাড়ির কাছে আরশিনগর.....7

২. দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি দূর করার চারটি অনুশীলন.....18

৩. ক্লান্তি থেকে বাঁচার উপায়.....26

৪. যে বিরক্তি ক্লান্তি দুশ্চিন্তা আর নৈরাশ্য আনে তাকে নির্বাসন দেয়া দরকার.34

৫. আপনার যা আছে তার মূল্য লক্ষ ডলার.....44

৬. অকারণ সমালোচনা ক্ষতি ডেকে আনে.....55

৭. সমালোচনা প্রতিরোধের উপায়.....61

৮. মধু আহরণে ব্যর্থ হলে মৌচাকের দোষ নেই.....68

৯. জনসংযোগের গোপন কথা.....86

১০. কর্মঠ লোকের পায়ের নিচে পৃথিবী : কর্মহীনকে একাকী নির্জন পথে চলতে হয়.....103

১১. বন্ধুত্ব লাভের সহজ পথ.....132

১২. লোকের মন জয় করবার রহস্য 148

১৩. মন জয় করবার সহজ উপায় 158

১৪. চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সচেষ্ট হোন.....174

প্রসঙ্গ-কথা

আমাদের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশায় পূর্ণ জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয় কর্মের চিন্তায়। আসুন, এই কর্মজীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিময় করে তোলার চেষ্টা করি। হয়তো আপনি ব্যস্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে, যার সাথে মিলে আছে আরো অনেক লোকের স্বার্থ, তখন আপনার মুহূর্তের ভুল আপনাকে এবং সেইসব মানুষদের। সকলকেই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেই। ফলে সারাদিন অজস্র পরিশ্রম করেও দিনের শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিমর্ষ হয়ে পড়বেন। এই হতাশার হঠাৎ আঘাতে আপনার কাছে জীবন হয়ে উঠবে হয়তো দুর্ভাবনার। কর্মজীবন হয়ে উঠবে বৈচিত্রহীন, আনন্দহীন। তখন একটু অবসরের জন্যে মনটা আপনার তৃষ্ণার্ত হয়ে। উঠবে।

নিঃসন্দেহের মনের বিজ্ঞানী ডেল কার্নেগির এই রচনা আপনাকে ওই হতাশ, অন্ধকার জীবনে আলোর সন্ধান দেবে! কারণ এই মানুষটির এই অমূল্য রচনা পাঠ করে পৃথিবীর সব প্রান্তের কোটি কোটি মানুষ পেয়েছে জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সফলতা। ডেল কার্নেগির এই বইটি তার কল্পনপ্রসূত অন্তঃসার শূন্য উপদেশ নয়। এটি তার আয়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল। এটি তার সংগ্রামী চেতনালব্ধ জীবনদর্শন। মনে করুন, আমরা আজ থেকেই সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে, ডেল কার্নেগির প্রদর্শিত পথে চলতে শুরু করি। পাকা ডুবুরীর মতো বিস্তীর্ণ এই সংসার সমুদ্রের অতল থেকে যিনি তুলে এনেছেন অসংখ্য অভিজ্ঞতার রত্নসম্ভার, তার সেই অমূল্য সঞ্চয় মুদ্রিত এ গ্রন্থে।

এ বই আপনাকে দেবে হাজার আনন্দের রোশনাই। এমন বন্ধু, এমন স্বজনের সান্নিধ্য আপনি লাভ করতে পারবেন, যা পাখির কূজনের মতো মধুর, সূর্যের রশ্মির মতো দৃপ্ত, চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ। আপনি পেয়ে যাবেন সফল কর্মজীবনের চাবিকাঠি, জনচিত্ত জয় করবার জাদুকাঠি। কুসুমের মতো কোমল ও বজ্রের মতো কঠিন ব্যক্তিত্ব।

কর্মময় জীবনকে নিত্য নতুনভাবে সাজিয়ে নেয়ার সফলতা ছড়ানো আছে আপনার চারপাশে, শুধু চাই সঠিক ও নিষ্ঠ পরিশীলন। যা ডেল কার্নেগি শিখিয়েছেন, চিনিয়েছেন, আপনাকে-আমাকে-সকলকে।

আপনার কর্মজীবন সমৃদ্ধ হোক। সুখের ছোঁয়া লাগুক আপনার জীবনে এটুকুই আমার আন্তরিক কামনা। এসব বই আপনি কেন পড়বেন? এসব বই আপনাকে কীভাবে উপকার করবে? নিজেকে খুঁজুন। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আপনার কাছে আপনার নিজের সত্তা।

অনুসরণ নয়। অনুকরণ নয়। নিজেকে জানুন, সফলতার উপায় অর্জন করুন। নিজের পথে চলুন। সুন্দর, নিটোল, ছিমছাম কাজের চারটে উপায় আছে। তাহল : প্রথমত, কাজের টেবিল সবসময় পরিষ্কার রাখুন। অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরিয়ে ফেলুন। দ্বিতীয়ত, গুরুত্ব অনুযায়ী পরপর সাজিয়ে নিয়ে কাজ করুন।

তৃতীয়ত, সমস্যা যখনি আসবে তখনি তার সমাধানে সচেষ্ট হোন, তবে তড়িঘড়ি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন।

চতুর্থত, ক্লান্ত বা অবসন্ন করে এমন কোনো বিশৃঙখল কাজ করবেন না। সফল ও সুন্দর কাজের জন্যে সবচেয়ে জরুরি সংগঠন, শৃঙ্খলী আর নিয়ন্ত্রণ।

ক্লান্তি, বিষণ্ণতা, হতাশা আর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবার সহজ কিছু পন্থা আছে, তাহল :

প্রথমত, সঠিক সঙ্গী নির্বাচন। জানেন তো, প্রিয়তমা তরুণীর সাথে দশ মাইল হেঁটে গেলেও আপনি ক্লান্ত হবেন না, কিন্তু একান্ত আপনজন হলেও বিরক্তিকর স্ত্রীর সঙ্গে দশ পা হাঁটতেও আপনার কষ্ট হবে। এর কারণ খুঁজে বের করা ও সমাধান করা।

দ্বিতীয়ত, এই আত্মবিশ্বাস সর্বদা জাগরূক রাখা যে, আপনার যা আছে তার দাম লক্ষ টাকারও বেশি।

তৃতীয়ত, সস্তা ও অকারণ সমালোচনার প্রশয় দেবেন না। কারণ তা আপনার ব্যক্তিসত্তাকে ছোট করবে। অতি প্রশংসা আপনার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করবে। আপনি হতাশ হবেন।

চতুর্থত, কখনোই কাজে ফাঁকি দেবেন না। নিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতাই আপনাকে নিশ্চিন্ত করবে। ছদ্ম। প্রশংসায় আপ্লুত হলে, আপনি কাজ করবেন কেমন করে।

পঞ্চমত, আপনার চারপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র সুযোগ। তাকে হেলায় হারাবেন না। মধু আহরণে আপনি যদি ব্যর্থ হোন তার জন্যে মৌচাককে দায়ী করতে পারেন না। মধু আহরণের সহজ পন্থা কি, খুঁজে নেয়া। আশাবাদী হওয়া।

ষষ্ঠত, জনসংযোগের কয়েকটি সহজ রাস্তা ডেল কার্নেগি দেখিয়েছেন এ বইতে, যা আপনাকে প্রফুল্ল রাখবে।

সপ্তমত, কর্মই জীবন, এ কথা মনে রাখবেন। যে কর্মঠ সে বিশ্ব জয় করতে পারে। অলস কর্মহীন মানুষকে সবাই বর্জন করে। একাকী নির্জন পথে তাকে চলতে হয় বিষণ্ণ ও হতাশ হয়ে।

স্বজনশূন্য মানুষ অসহায়। জীবনে খুশি ও সহায়তায় আশ্বাস দেয় প্রিয়জন, স্বজন। সেই স্বজনের বন্ধুত্ব লাভ করার কয়েকটি সরল পথ ডেল কার্নেগি দেখিয়েছেন এই পর্যায়ে। জনচিত্ত জয় করার গুরুত্বপূর্ণ গুণটি কীভাবে আয়ত্ত করা যায় তার মূল্যবান চাবিকাঠি কেমন করে পাওয়া যাবে সে পথ দেখিয়েছেন ডেল কার্নেগি।

সংকলক

.

১. বাড়ির কাছে আরশিনগর

দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে এক মহিলা আমাকে একটি চিঠি লিখে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু সমস্যা জানিয়েছেন। আত্মগৌরবের অভাব কীভাবে মানুষের জীবনকে ব্যথাতুর ও বিফল করে তোলে, তা দেখাবার জন্য এবং আত্মবিশ্বাসের জোর যে কত প্রয়োজন, সেই বিফল মানুষকে আবার সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে তা জানাবার জন্যে আমি এই চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরছি :

'ছোট থেকে আমি লাজুক ও মুখচোর। মা আমাকে সর্বদা নিজের মতো বুঝিয়েছিল যে, সুন্দর পোশাক পরে সাজসজ্জা করা ঠিক নয়। তা মানুষকে বোকা ও অহংকারী করে তোলে। আমি তাই সাজতাম না। কোনো পার্টিতেও যেতে চাইতাম না মুখচোরা স্বভাবের জন্যে। মাও আমাকে বাইরে কারো সাথে মিশতে দিতেন না। স্কুলজীবন এভাবেই কাটল। আস্তে আস্তে আমি অসামাজিক হয়ে উঠলাম। একাঁদেরে এবং হীনম্যতার জন্য নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেলাম। কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে–স্যাঁৎসেঁতে বিরক্তিকর হয়ে উঠল আমার অস্তিত্ব।

'আমার বিয়ে হল। আমার স্বভাব বদলাল না। আমার ননদেরা যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্তা, আধুনিকা। তাদের পাশে নিজেকে ভীষণ বিবর্ণ লাগতে লাগল। আমার মনে ভয় এল, এবার আমার স্বামীও আমাকে করুণা করবেন। বিরক্ত হবেন। আমি যতই তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে চাইলাম, ততই যেন খাপ খাওয়াতে না পেরে দূরে সরে আসতে লাগলাম। নিজের সীমিত গণ্ডিতেই আমি আবদ্ধ থাকলাম।

‘কখনো ভীষণ আবেগ আমাকে নাড়া দিত। আবার কখনো থাকতাম চুপ করে। দিনগুলো বিশ্রী নিরানন্দতায় কাটতে লাগল। নিজের অস্তিত্ব এবার আমার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। আমি আত্মঘাতী হবার চিন্তা করলাম।‘

কেন একটি নিরপরাধ মেয়ের জীবন এমন বিষাদে ভরে গেল জানেন? স্রেফ আত্মবিশ্বাস আর আত্মানুসন্ধানের অভাবে। কারণ মেয়েটি নিজের সত্তাকে সবচেয়ে বড় বলে তখনো বুঝতে পারে নি।

এবার আর একটি অংশ তুলে ধরছি : তিনি আরো লিখেছেন–একটি কথায় আমার জীবনের ধারা বদলে গেল। আমার শাশুড়ি মায়ের একটি কথা। তিনি বললেন–যা ঘটে গেছে তাকে নিয়ে না ভেবে যে দিনগুলো সামনে আসছে তাকেই তিনি সারাজীবন যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে। তিনি নিজে আত্মশক্তির মূল্য যেমন বুঝতেন তেমনি তার সন্তানদের বোঝাতেন। এভাবে তাদের চরিত্রগঠনে তিনি সাহায্য করেছিলেন। এবং সফল হয়েছিলেন। নিজের সত্তার ওপর তার সুগভীর শ্রদ্ধা তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন।

‘আমার শাশুড়ির ওই কথা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। নিজেকে নিয়ে সেই থেকে আমি ভাবতে শুরু করলাম। নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করলাম, শুরু হল আমার আত্মসমীক্ষা। আমি বন্ধু খুঁজতে শুরু করলাম। সামাজিক হতে চাইলাম। ছোট সংগঠনে যোগ দিলাম। ভয় কেটে গিয়ে আমার চরিত্রে ফিরে এল চমকার সাবলীলতা। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই সপ্রতিভ আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করলাম আমি। আত্মোপলব্ধির

আলোয় বুঝলাম-যা ঘটে গেছে তার জন্যে দুঃখ না করে ভবিষ্যৎকে ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হয়।'

দেখলেন তো-কীভাবে মেয়েটি নিজেকে খুঁজে পেলেন। আসলে গভীর আত্মবিশ্বাসই শেষপর্যন্ত মেয়েটিকে মৃত্যুর চিন্তা থেকে জীবনের আলোয় আলোকিত করল। আত্ম-অন্বেষণ পৌঁছে দিল সফলতার শীর্ষে।

এবার বলছি আমার আর একটি অভিজ্ঞতার কথা।

'ডক্টর জিভাগো' এবং 'ফল হুম দি বেল টোলস'-এর সুবিখ্যাত পরিচালকেরও একটা বিশেষ সমস্যা ছিল। তিনি নিজে এই ছবির জগতে আসবার আগে ছিলেন একজন ব্যবসায়ী তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিক্রির পরিমাণ বাড়ানো। কিন্তু বাণিজ্য আর অভিনয় শিল্প এক নয়। এখানে চটজলদি একজনকে পাখি পড়ানো যায় না। তার কিছু প্রতিভা থাকা অবশ্যই দরকার। কিন্তু বেশি তাড়াতাড়ি কাজ পাবার তাড়নায় তিনি নবাগতদের বেশি রকম উৎসাহ দিতেন। ফলে অভিনয় কিছু না জেনেও পরিচালকের উৎসাহে তারা নিজেদের দ্বিতীয় গ্রেটা গার্বো ভাবতে শুরু করে দিতেন। আর ওইসব অন্তঃসারহীন অভিনেতাদের আত্মম্ভরিতায় তিতো বিরক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত পরিচালক বুঝতে পারলেন, মানুষকে দিয়ে

সুখীজীবন ও কাজের সন্ধানে বাঁদরের অভিনয় করানো, বা তোতাপাখির মতো বুলি শেখানো যাবে না। তিনি বুঝলেন, নিষ্ঠাহীন, প্রতিভাহীন মানুষ যা নয় তাই ভান করে। সুতরাং তাদের বাহবা না দিয়ে বিদায় দেয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত।

দেখলেন তো আত্মসমীক্ষা, অন্বেষণ শেষপর্যন্ত বিখ্যাত পরিচালকটিকে সঠিক মানুষ চিনতে সহায়তা করল কীভাবে।

একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এ সম্পর্কে একটি দারুণ মন্তব্য করেছেন–নিজেকে অন্বেষণ করার পদ্ধতিটি ইতিহাসের মতোই প্রাচীন আর মান জীবনের মতোই সার্বজনীন।

এবার আর একটি সমস্যার কথা শুনুন। যে ব্যক্তি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতে বাধ্য হয়, তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর হয় না। এবং মনস্তাত্ত্বিক এই জটিলতার কথা অ্যানজেলো প্যাটরি প্রমুখ লেখকেরা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন। এই বোধ মানুষকে কমজোরী করে। হতাশ, অসফল করে। এই হতাশাকেও জয় করা যায় সঠিক বন্ধুর আন্তরিক পরামর্শে। একটা ঘটনা বলি–শুনুন :

এক কন্ডাক্টরের একটি মেয়ে ছিল। পেশায় ছিল সে গায়িকা। সে দেখতে ভালো ছিল না। দাঁত উঁচু পুরু ঠোঁটের জন্যে তার মধ্যে একটা হীনমন্যতার ভাব ছিল। তাই প্রথম দিকে সে হোটেলে নাইট ক্লাবে গাইতে এসে হাত দিয়ে তাঁর উঁচু দাঁতটাকে ঢেকে রাখতে চাইত। তাঁর এই নিজের ত্রুটিকে ঢেকে রাখার প্রয়াসকে নিয়ে সবাই কিন্তু ভীষণ ঠাট্টা করত। অথচ তার গানের গলা ছিল খুব মিষ্টি। তাও সে সফল হতে পারছিল না। সকলের উপেক্ষা, তামাশায় সে নিজের বিশ্বাস, জোর সব হারিয়ে ফেলে, বড় বেশি হতাশ হয়ে পড়ছিল। কেউ তাকে ভালোবাসে না। এই হতাশ চিন্তার মধ্যে একজন ভক্তকে সে পেল, যে সহানুভূতির সঙ্গে তার ভুলটা তাকে ধরিয়ে দিল। সে তার বলল, নিজের দৈহিক ত্রুটিকে ভুলে গিয়ে তার উচিত তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো, আত্মশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। মেয়েটা এবার দাঁত-মুখ খোলা রেখে আন্তরিক নিষ্ঠায় তার

সুরেলা গলায় গান গাইতে শুরু করল। কালক্রমে দর্শক সাধারণ তার অপূর্ব সুরের মায়ায় আপ্লুত হয়ে গেল। মেয়েটি জনসাধারণের মন জয় করে জনপ্রিয় গায়িকা হয়ে উঠল।

দেখা গেল মানসিক শক্তির জোর এবং বন্ধুর সস্নেহ পরামর্শে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু সবসময় তার করে না বলেই সব মানুষ সফল হয় না।

প্রখ্যাত মনোবিশ্লেষক জোসেফ হেওয়ার্থ বলেছেন যে, মানুষ তার সুপ্ত মানসিক শক্তির শতকরা দশভাগ মাত্র পারে উন্মোচিত করতে। অর্থাৎ সে যা করতে পারে তার অনেকখানি করা হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ আমরা যেন অর্ধেক মাত্র জেগে আছি। আমাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির সবটাই থাকে সুপ্ত। সে প্রচণ্ড শক্তিকে জাগানো যথেষ্ট কঠিন। তবুও জাগরণ দরকার।

আসুন, আমরা জেগে উঠি। এখন থেকে যেন একটুও সময় নষ্ট না হয়। মনে রাখবেন, আপনি হলেন এই পৃথিবীর এক মূল্যবান সৃষ্টি। আপনার জীবনের শুরু থেকে আজ অবধি ঠিক আপনার মতো আর কেউ কখনো আবির্ভূত হয় নি। ভবিষ্যতেও আর কেউ আসবে না। এই বোধই হবে আপনার শক্তি।

আপনার জানা দরকার অবশ্যই যে বংশানুক্রমের (genetics) আধুনিক বিজ্ঞান এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করেছে যে, আপনি হলেন ৪৮টি ক্রোমোজমের সমন্বয়ে গঠিত জীবন। এর ২৪টি এসেছে আপনার বাবার কাছ থেকে আর বাকি ২৪টি এসেছে আপনার মায়ের কাছ থেকে। আপনি যা কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করছেন তা এই

৪৮টি ক্রোমোজমের মধ্যেই নিহিত আছে। আবার এই ৪৮টি ক্রোমোজমের মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার জিন। এই জিনের এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি মাত্র জিন একজন মানুষের সমগ্র জীবনধারা আমূল বদলে দিতে পারে।

তাই আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, আমাদের জীবন সৃষ্টি এক অত্যাশ্চর্য পদ্ধতি।

আপনার বাবা মায়ের যে মিলনের ফলে আপনার জন্ম তা কিন্তু তিন লক্ষ বিলিয়নে মাত্র একবার। এই তিন লক্ষ্য বিলিয়নে প্রত্যেকটি যাদের জন্ম হতে পারত সেই মানুষের স্বভাব হতে পারত আপনার থেকে একদম আলাদা। ভীষণ অবাক করা ব্যাপার নয় কি?

মজার কথা হচ্ছে, এটা কোনো খেয়ালী কল্পনা নয়, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত।

নিজের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, যোগ্যতা, বিশেষত্ব সম্পর্কে মানুষ যদি যথার্থ অবহিত না হয়, তাহলে তার দ্বারা কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে না। সে শুধুই অপরকে অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের সৃষ্টিকে তালগোল পাকিয়ে নষ্ট করে ফেলে–এই কথাটা আমাকে অনেক ঠকে শিখতে হয়েছিল।

ঘটনাটা বলছি :

আমি গ্রামের ছেলে। চিন্তায়, অভ্যাসে, ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবে রয়েছে গ্রাম্যতা। অথচ শহরে এসে আমি আমার স্বপ্ন সফল করতে চাইলাম, অর্থাৎ অভিনেতা হতে চাইলাম শহরের প্রতিষ্ঠিত নামকরা অভিনেতাদের মতো। তখন আমার মনে হত সহজে নাম কেনার উজ্জ্বলতম পথ অভিনয় জীবন। ভর্তি হলাম আমেরিকায় ইন্‌স্টিটিউট অব

ভিজুয়াল আর্টকে। মন দিয়ে পড়তে লাগলাম পল রজার্স, ওয়াটার হাম ডেন, গ্রেট গার্বোর মতো কিংবদন্তী নায়কদের জীবনী। প্রচণ্ড উৎসাহে ভাবতাম কেন যে হাজার হাজার মানুষ অভিনেতা হবার চেষ্টা করে না। অর্থাৎ আমার মনে হয়েছিল যে-কেউই ইচ্ছে করলে এ জগতে নাম করতে পারে।

আমি ওই সুবিখ্যাত অভিনেতাত্রয়ের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি অনুসরণ ও অনুকরণ করার চেষ্টায় মেতে উঠলাম। জীবনের অনেকগুলো বছর আমি শুধু অন্যের অনুকরণ করে বাজে খরচ করে ফেললাম। একবারও আত্ম-অনুসন্ধান করলাম না। বুঝতে চেষ্টা করলাম না–আমার গ্রাম্য মোটা মাথায় ওইসব অনুসরণ ঢুকবে কিনা আদৌ। আমার অভিনেতা হবার সাধ অপূর্ব রয়ে গেল। আমি হতাশ হলাম।

এবার ভাবলাম লিখব। প্রথমে আমি যখন আমার নিজস্ব ভাবনায় লিখতে শুরু করলাম–সেইগুলি সমাদৃত হল। এমন সব বই লিখতে শুরু করলাম যা বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠতা পেতে পারে। কিন্তু অনুসরণ ও অনুকরণের পোকা ছিল আমার মাথায়। তাই একালের সফল লেখকদের চিন্তা-ভাবনা ধার করে লিখতে চাইলাম। ফল হল উল্টো, লেখা হয়ে গেল জগাখিচুড়ি। যা কারুর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমারই সন্দেহ হল।

অবশেষে সম্বিত ফিরল আমার। বুঝলাম অন্যের চিন্তাধারা আমার কলমে এসে তালগোল পাখিয়ে দুর্বোধ্য হয়ে গেছে এমনই, যা কোনো প্রকাশকই গ্রহণ করবে না।

আমি এক বছরের পণ্ডশ্রম বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করে শুরু করলাম নতুন করে। বিবেক বলল, তুমি ডেল কার্নেগি। তোমার নিজস্ব ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা আছে। তুমি তো অন্য কারো ভূমিকায় সফল হতে পার না।'

পাঁচমিশালি বই লেখার পরিকল্পনা ছেড়ে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা শুরু করলাম এবং অচিরেই আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় জনসংযোগের ওপর লিখে ফেললাম। আমার মনে হল, এতদিনে আমি আমার কথা

সকলকে পৌঁছে দিতে পেরেছি। এ সম্পর্কে আমার অক্সফোর্ডের অধ্যাপক স্যার ওয়াল্টার রালফের কথা। মনে পড়ছে। উনি মন্তব্য করেছিলেন, শেক্সপিয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোনো বই তো লিখতে পারি না, তবে আমি আমার মতো বই লিখেছি।

নিজেকে খুঁজুন। মনে করুন, ইরডিন বার্লিনের সেই অমূল্য উপদেশ যা তিনি দিয়েছিলেন জজ গেরেস উইনকে। যখন বার্লিন আর গেরেস উইনের মধ্যে প্রথম দেখা হয় তখন বার্লিন ছিলেন বিখ্যাত মানুষ, আর গেরেস উইনের টিম প্যাম আলেতে সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে গান লেখার কঠিন সংগ্রামরত এক যুবক।

গেরেস উইনের ক্ষমতায় অভিভূত বার্লিন তাকে নিজের সংগীত বিভাগের সম্পাদক করে দেয়, মাইনে দেন প্রায় তিনগুণ। তারপর বলেন, দু'নম্বর বার্লিন হয়ো না। চেষ্টা করলে একদিন তুমি প্রথম শ্রেণীর গেরেস উইন হতে পারবে। বার্লিনের এই মন্তব্য গেরেস উইনের সুপ্ত প্রতিভাবে জাগিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। গেরেস উইন নিজের মতো করে

নিজেকে পরিচালিত করে কালক্রমে হয়েছিলেন–আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, সংগীতকার। অর্থাৎ গেরেস উইন নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

এবার আমি সমস্যা থেকে কীভাবে মানসিক ক্ষমতা, মুক্তি দিতে পারে, কোন্ সে শক্তি যা শান্তি দিতে মানুষকে, তা পৃথিবীর সফল বিখ্যাত মানুষদের উপলব্ধি সত্য বোধ থেকে বিবৃত করছি এই অধ্যায়ে।

চার্লি চ্যাপলিন, উইল রজার্স, মেরি মার্গারেট ম্যাকব্রাইড, জিনে আউট্রি প্রমুখ বহু মানুষের অভিজ্ঞতা এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, আত্মানুসন্ধানই সবচেয়ে বড় উপায় জীবনে সফল হতে গেছে।

চার্লি চ্যাপলিন, যিনি তাঁর অভিনয় ও পরিচালনায় সিনেমাজগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। জয় করেছিলেন পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানুষের মন, তিনি যখন রুপালি পর্দায় প্রথম পায়ে ছাপ রাখেন তখন পরিচালক তাঁকে সেকালের এক বিখ্যাত জার্মান কৌতুক শিল্পীকে অনুকরণ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু চার্লি অনুকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর আত্মশক্তি ছিল প্রখর। তাই তিনি তাঁর নিজের মতো করেই চলতে থাকেন, এবং পরিণত হন আজকের চার্লিতে।

বব হোপরোর অভিজ্ঞতাও এমনই। বহু বছর অন্যের অনুকরণ করে। তিনি হঠাৎ উপলব্ধি করেন, নিজের মতো করে চলাটাই সফলতার পথ।

মেরি মার্গারেট নিউইয়র্কের সবচেয়ে বড় বেতার শিল্পী হবার আগে বহু বছর এক আইরিশ অভিনেত্রীকে অনুকরণ করে বিফল হন।

জিনে আউট্রি তাঁর টেক্সাস ভাষা ত্যাগ করে শহুরে পোশাক পরে নিজেকে নিউইয়র্কবাসী বলে জাহির করতে গিয়ে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। শেষে আত্মোপলব্ধি তাকে সঠিক পথ দেখায়। তিনি নিজে যেমন, তেমনি পোশাক অর্থাৎ গ্রাম্য কাউবয়দের পোশাকে সহজ মেঠো গান গেয়ে পৃথিবীতে জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

ওপরে আলোচিত সমস্ত বিখ্যাত মানুষই কিন্তু বুঝেছিলেন যার যার নিজের নিজের ক্ষেত্রে তারা সকলেই এক এবং সম্পূর্ণ একক এক সঙ্ঘ।

আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, আপনি এই পৃথিবীতে এক এবং একাই একটি সম্পূর্ণ সঙ্, আপনার স্ব-কর্মক্ষেত্রে, জীবনপথে। প্রকৃতি আপনাকে যে শক্তি দান করেছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন, নিজের ক্ষমতার বাইরে কখনো পা রাখবেন না। আপনাকে আপনার পরিবেশ, আপনার বংশ পরিচয় যা দিয়েছে তাই নিয়ে তৃপ্ত হোন, অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে নিজের সত্তাকে ছোট্ট করবেন না।

কবি ডগলাসের একটা চমৎকার কবিতা শুনুন, কত সহজসরল ভাষায় কী গভীর উপলব্ধির প্রকাশ এ কবিতায় রয়েছে :

যদি হতে না-ই পারো বড় পাইন,
উপত্যকায় হও ছোট গাছ।
তা-ও যদি না পারো তো হয়ে যাও
সবুজ নরম এক ঝোঁপঝাড়।
মন্দ কি যদি হও দূর্বা

বৃক্ষের থেকে কত দূর বা।
তুমি তো তুমিই আছ তোমাতেই
লজ্জা কি, সাহস তো দূর্বার।
নাইবা ফুটলে হয়ে পদ্ম
না-হয় ফুটলে বনফুলটি।
কি লাভ সজ্জা ধরে ছদ্ম
প্রকৃতির কানে দোলো দুলটি।
সবাই গায়ক যদি হতে চাও
নীরব শ্রোতাটি হবে কে তবে
সেই ভালো, যার যার তার মতো হয়ে যাও
সেই হওয়াতে ব্যথা নেই জানবে।
বড় বেশি বড়ো হতে যদি লাজ
হয়ে যেয়ো ছোট এক সলতে
সূর্যের খরতাপ নাই হও
তারার মতন শিখো জ্বলতে।'

আবার বলছি–অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, নিজের পথে চলুন, নিজেকে জানুন, নিজেকে খুঁজুন।

২. দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি দূর করার চারটি অনুশীলন

ভালো কাজ করার এক নম্বর অভ্যাস : ‘ডেস্ক থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া বাকি সব সরিয়ে ফেলুন।‘

শিকাগো আর নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের প্রেসিডেন্ট রোল্যান্ড এল. উইলিয়ামস বলেন : কোনো মানুষ যদি সহজে কাজ করতে চান তাহলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ফাইলপত্র ছাড়া তার টেবিলে বাকি সব কাগজ সরিয়ে ফেলাই উচিত। আমি একে এক নম্বর ভালো কাজ করার পথ বলে মনে করি আর এটা সবচেয়ে সেরা যোগ্যতার মাপকাঠি।

আপনি যদি ওয়াশিংটন ডি. সি-র লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে কখনো বেড়াতে যান তাহলে ছাদের নিচে কবি পোপের লেখা এই কটি কথা লেখা আছে দেখতে পাবেন : ‘নিয়মানুবর্তিতাই স্বর্গের প্রথম নিয়ম।’

ব্যবসাজগতেও প্রথম কানুনটি হওয়া উচিত নিয়মানুবর্তিতা। কিন্তু সত্যিই তাই কি? না, কারণ গড়পড়তা ব্যবসাদারদের টেবিল কয়েক সপ্তাহ হাত পড়ে নি এমন সব কাগজপত্রেই বোঝাই হয়ে থাকে। ব্যাপারটা এমনই ঘটে। একবার নিউ অর্লিন্সের একজন প্রকাশক আমাকে বলেন যে, তাঁর সেক্রেটারি তার টেবিল সাফ করতে গিয়ে একটা টাইপরাইটার খুঁজে পায় সেটা নাকি দু’বছর আগে হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হয়!

টেবিল স্তূপীকৃত কাগজপত্র দেখলেই বিরক্তি, উত্তেজনা আর চিন্তার উদ্রেক হতে চায় কিন্তু ব্যাপারটা তার চেয়েও খারাপ। সবসময় হাজার হাজার কাজের কথা আর সেগুলো করতে সময়ের অভাব–শুধু যে উত্তেজনা আর ক্লান্তি বাড়িয়ে দেয় তাই নয় বরং এটা আপনার ব্লাড প্রেসার, হার্টের রোগ আর পেটের আলসার রোগেরও কারণ হয়ে উঠতে পারে।

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ড. জন এইচ. স্টে একবার আমেরিকান জাতীয় মেডিক্যাল কনভেনশানের সামনে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন–নাম ছিল জৈবিক রোগের জটিলতার আসল কারণ। ওই প্রবন্ধে ড. স্টোন্স এগারোটি অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথমটা ছিল এই রকম :

‘বাধ্যতামূলক কিছু করার ধারণা : সামনের অফুরন্ত কর্তব্য যা করতেই হবে। কিন্তু এই টেবিল সাফ রাখার মতো সাধারণ কাজ করে আর কোনো কাজের ধারণা মাথায় নিয়ে, কেমন এই উচ্চ চাপ দূর করে যা করতেই হবে সেটা সমাধা করা যাবে? বিখ্যাত মনোসমীক্ষক ড. উইলিয়াম এল, স্যাডলার কোনো-এক রোগীর কথা জানিয়েছেন, যিনি এই সহজ পথ গ্রহণ করার ফলে প্রায় স্নায়বিক অবসাদে ভেঙে পড়ার হাত থেকে রেহাই পান। ভদ্রলোক শিকাগোর কোনো প্রতিষ্ঠানের মস্ত বড় একজন কর্মচারী। তিনি যখন ড. স্যাডলারের চেম্বারে আসেন তখন তিনি দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর স্নায়বিক দুর্বলতার শিকার হয়েছেন। তিনি জানতেন তাঁকে শিগগিরই মাটিতে পড়তে হতে পারে, কিন্তু কাজ ছেড়ে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর সাহায্যের দরকার ছিল।

‘ভদ্রলোক যখন তার নিজের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন, ড, স্যাডলার জানিয়েছিলেন; তখনই আমার টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন এসেছিল হাসপাতাল থেকে। দেরি না করে আমি সে সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবার বন্দোবস্ত করলাম। পারলে আমি সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ করি। ফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার সেটা বেজে উঠল। এবারেও জরুরি দরকার, তাই কথাবার্তা বলতে সময় লাগল। তৃতীয়বার বাধা পেলাম আমার এক সহকর্মী যখন মারাত্মক রুগ্ন এক রোগীর জন্য পরামর্শ চাইতে এলেন। তাকে বিদায় দিয়ে যখন অপেক্ষারত ভদ্রলোকের কাছে এসে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্য মাপ চাইলাম, ভদ্রলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখে মুখে সম্পূর্ণ আলাদা অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম।’

‘মাপ চাইবেন না, ডাক্তার!’ ভদ্রলোক স্যাডলারকে বললেন, “গত দশ মিনিটে মনে হয় বুঝতে পেরেছি আমার গোলমালটা কোথায়। আমি অফিসে ফিরে আমার কাজের ধারা বদলে ফেলতে চাই, কিন্তু . যাওয়ার আগে আপনার কি আপত্তি আছে, আমি যদি আপনার কাজের ডেস্কটা একটু দেখি?

ড. স্যাডলার তার ডেস্কের ড্রয়ারগুলো খুলে ধরলেন। সবই খালি-শুধু সামান্য ঔষুধ পত্র ছাড়া। বলছেন কি, ডাক্তার আপনার শেষ না হওয়া কাগজপত্র কোথায় রাখেন? ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

‘সব কাজ শেষ।’ স্যাডলার জানালেন।

‘জবাব না দেয়া চিঠিপত্র কোথায় রাখেন?

‘সব জবাব দেয়া হয়ে গেছে স্যাডলার জানালেন। আমার কাজকর্মের নিয়ম হল, উত্তর না দিয়ে কোন চিঠি আমি ফেলে রাখি না। আমি আমার সেক্রেটারিকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর দিই।’

সপ্তাহ ছয়েক পরে ওই একই ভদ্রলোক ড. স্যাডলারকে তার অফিসে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি বদলে গিয়েছিলেন–আর তাঁর ডেস্কও ঠিক তাই। তিনি ডেস্কের ড্রয়ার খুলে দেখালেন শেষ হয় নি এমন কাজ জমানো নেই। ছ’ সপ্তাহ আগে আমার তিনটে ডেস্ক দুটো আলাদা অফিসে ছিল–সেগুলো কাজের ফাঁকে পর্বত সমান হয়ে উঠেছিল। কখনই কাজ শেষ করতে পারতাম না। আপনার সঙ্গে দেখা করে আসার পর ওয়াগন বোঝাই করে প্রতিবেদন আর পুরনো কাগজপত্র সরিয়ে ফেলি। আর এখন আমি কোনো কাজই ফেলে রাখি না, একটা ডেস্কে বসে কাজ করে চলি, জমানো কাজে ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা আনতে দিই না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছি। আমার স্বাস্থ্যে কোন গণ্ডগোল আর নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চার্লস্ ইভান্স হিউজেস বলেন : মানুষ অতিরিক্ত কাজের ফলে মারা যায় না। তারা মারা পড়ে বিক্ষিপ্ততার আর দুশ্চিন্তার জন্যই, কারণ তারা কখনই তাদের কাজ শেষ করতে পারবে এ কথা ভাবতে পারে না।

ভালো কাজ করার দুই নম্বর অভ্যাস : ‘গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলি শেষ করুন।

‘রাজ্য জোড়া সিটিজ সার্ভিস কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি এল, ডুহার্টি একবার বলেন যে, যত মাইনেই তিনি দেন না কেন দুটো জিনিস লোকদের কাজ থেকে পাওয়া তিনি অসম্ভব বলেই দেখেছেন।

সেই দুটি অমূল্য ক্ষমতা হল : প্রথমটি, চিন্তা করার ক্ষমতা। দ্বিতীয়টি, গুরুত্বের ক্রম অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা।

সামান্য অবস্থা থেকে মাত্র বারো বছরে ক্ষমতার শিখরে উঠে পেপসোডেন্ট কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হন যে ছেলেটি তার নাম চার্লস্ লাকম্যান। তিনি আয় করেছেন, বছরে কয়েক লক্ষ টাকা আর জীবনে এছাড়াও আয় করেছিলেন বহু লক্ষ টাকা। তিনি জানিয়েছিলেন যে, হেনরি এল ডুহার্টি যে দুটো গুণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলে ভেবেছিলেন সেই দুটি গুণের প্রতিই তাঁর সাফল্যের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতে চান। চার্লস্ লাকম্যান লেখেন : যতদূর আমার মনে পড়ে আমি ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পড়তাম কারণ তখনই আমি অন্য সময়ের চেয়ে ভালোভাবে চিন্তা করতে পারতাম। তখন ভালোভাবে চিন্তা করে আমার সারাদিনের পরিকল্পনা করতে পারতাম আর কাজের গুরুত অনুসারে কাজের ব্যবস্থা করতাম।

আমেরিকার সবচেয়ে সফল বীমার সেলসম্যান ফ্রাঙ্ক বেটজার সারাদিনের কাজ করার পরিকল্পনা ভোর পাঁচটার পরে আদৌ করতেন না। আগের রাতেই তিনি তাঁর পরিকল্পনার ছক তৈরি করতেন-নিজের কাজের একটা সীমাও ঠিক করে রাখতেন-সীমা হল পরের দিন আনুমানিক কত টাকার বীমা করাতে পারবেন। সেটা যদি করতে না পারতেন তাহলে টাকাটা পরের দিন যোগ করে নেন–এভাবেই চলে।

আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কারো পক্ষে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী সব সময় কাজ করা সম্ভব হয় না, তবে আমি এটাও জানি যে প্রথমের কাজ প্রথমে করার কোনো একটা পরিকল্পনা করে রাখাও ভালো। আর সেই কাজ করতে করতে এগিয়ে চলা সবচেয়ে ভালো উপায়।

জর্জ বার্নার্ড শ যদি আগের কাজ আগে করার ব্রত না নিতেন, তাহলে হয়তো লেখক হিসেবে তিনি ব্যর্থই হতেন, এবং সারাজীবন একজন ব্যাংকের ক্যাশিয়ার হয়েই কাটাতেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল প্রতিদিন অন্তত পাঁচ পাতা লেখা। এই হৃদয়বিদারক পরিকল্পনা তাঁকে প্রায় নয় বছরে তিনি মাত্র ত্রিশ ডলার রোজগার করতে পেরেছিলেন–রোজ মাত্র এক পেনি। এমন কি রবিনসন ক্রুশোও রোজ কি করবেন তার একটা কার্যক্রম বানিয়ে রাখতেন।

ভালো কাজ করার তিন নম্বর অভ্যাস : কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যার সমাধান করুন, যদি প্রয়োজনীয় তথ্য পান, অযথা ঝুলিয়ে রাখবেন না।

আমার একজন প্রাক্তন ছাত্র, এইচ. পি. হাওয়েল আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি যখন আমেরিকার বোর্ড অব স্টিলের ডাইরেক্টর বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন, তখন ওই বোর্ডের সভা বেশ সময় নিয়ে চলত–অনেক সমস্যার আলোচনা হত কিন্তু খুব কম সমস্যারই নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হত। ফল কি হত? বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য গোছা গোছা কাগজ বাড়ি নিয়ে যেতেন পড়ার জন্য।

শেষপর্যন্ত মি. হাওয়েল বোর্ডের ডাইরেক্টরদের রাজি করালেন এক এক সময় একটা করে সমস্যা নিয়ে আলোচনা আর সমাধান করতে। কোনো দীর্ঘসূত্রতা বা ফেলে রাখা চলবে না। হয়তো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হল সমস্যাটি সমাধান করবার জন্য আরো বেশি তথ্যের প্রয়োজন। সমস্যার সমাধান নানা রকম হতে পারে কিছু করা অথবা না করা, কিন্তু নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত অবশ্যই আসতে হবে। তবে পরের কাজটি গ্রহণ করার আগে একটা সমাধান করতে হবে। মি. হাওয়েল জানিয়েছেন, এর ফলে যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য-আর কোনো কাজই বাকি থাকে নি। সবকিছুই পরিষ্কার। কোনো সদস্যকেই আর কাগজের তাড়া বাড়ি নিয়ে যেতে হয় নি। আর কখনো অসমাপ্ত কিছু প্রস্তাবও পড়ে থাকে নি।

আমেরিকার স্টিল দপ্তরের জন্যই শুধু ওই নীতি নয়, এটা আপনার বা আমার জন্যেও এই নিয়ম প্রয়োগ করতে পারি।

ভালো কাজের চার নম্বর অভ্যাস : বহু ব্যবসায়ী অকাল মৃত্যুর মুখোমুখি হন, কারণ তারা অন্য কাউকে কোনো রকম দায়িত্ব না দিয়ে সবকিছুই নিজে করতে চান। এর ফলাফল কেমন হয়? ছোটো খাটো সবকিছু এবং গণ্ডগোল তাকে পাগল করে ছাড়ে। তার ভাগ্যে জোটে ছুটোছুটি, চিন্তা, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। দায়িত্ব অন্যের হাতে দেয়ার কাজটা শেখা বেশ শক্ত। এটা আমার ভালোই জানা আছে। আমার পক্ষে কাজটা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছিল। আমার অভিজ্ঞতায় আমি আরো জানি ভুল মানুষের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে কি ভয়ানক সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। তবুও দায়িত্ব দেয়া কঠিন হলেও দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বড় পদে আসীন কাউকে এটা দিতেই হবে।

যে মানুষ বিরাট ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন অথচ সংগঠনের কাজ, দায়িত্ব দান আর পর্যবেক্ষণ জানেন না তিনি সাধারণ : পঞ্চাশে বা ষাটের কোঠায় পৌঁছে গোলমালে ভোগেন–যে হৃৎপিণ্ডের গোলমাল উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাতেই হয়। কোনো জ্বলন্ত উদাহরণ চাইছেন? বেশ, তাহলে স্থানীয় সংবাদপত্রে শোকসংবাদ কলমে চোখ বুলিয়ে দেখুন।

৩. ক্লান্তি থেকে বাঁচার উপায়

একটা আশ্চর্যজনক আর উল্লেখজনক ব্যাপার জানাচ্ছি–শুধুমাত্র মানসিক পরিশ্রম আপনাকে ক্লান্ত করতে পারে না। শুনলে অসম্ভব বলেই মনে হবে। তবে কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা বের করতে চেষ্টা করছিলেন মানুষের মস্তিষ্ক পরিশ্রান্ত না হয়ে কতখানি কাজ করে যেতে পারে–যার বৈজ্ঞানিক নাম হল অবসাদ বা ক্লান্তি। এইসব বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে সতেজ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলের সময় কোনো অবসাদের চিহ্ন দেখা যায় না। আপনি যদি কোনো রোজ খেটে খাওয়া শ্রমিকের শিরা থেকে এক ফোঁটা রক্তা তার কর্মরত অবস্থায় বের করে আনেন, তাহলে দেখতে পাবেন সে রক্ত প্রচুর ক্লান্তিময় টক্সিনে ভর্তি। কিন্তু আপনি যদি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের এক ফোঁটা রক্ত নিতেন তাহলে দেখতে পেতেন তাতে কিন্তু ক্লান্তির নেই টক্সিনের ছিটেফোঁটাও নেই।

মস্তিষ্কের কথা বলতে গেলে দেখা যাবে মস্তিষ্ক কাজ শুরু করার গোড়াতেও যেরকম চলে আট বা বারো ঘণ্টা পরেও সেই রকমই কর্মক্ষম থাকে। মস্তিষ্ক হল সম্পূর্ণভাবে ক্লান্তিবিহীন কিছু...তাহলে আপনার ক্লান্তির কারণ কী?

মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, আমাদের অবসাদ বা ক্লান্তির প্রধান উৎস হল আমাদের মানসিক আর ভাবাবেগময় হাবভাব। ইংল্যান্ডের জনৈক খ্যাতনামা মনোসমীক্ষক জে, এ. ব্যাকফিল্ড তাঁর 'সাইকোলজি অব পাওয়ার' নামক গ্রন্থে বলেছেন : যে ক্লান্তিতে আমরা

বেশিরভাগ ভুগি তার বেশিরভাগই জন্ম নেয় মন থেকে। আসলে শুধুমাত্র দৈহিক কারণে অবসাদ প্রায় দেখাই যায় না।

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন মনোবিজ্ঞানী ড. এ. এ. ব্রিল আরো একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মত হল : যারা বসে কাজ করে থাকেন তাদের মতো সুস্থ মানুষের শতকরা একশ' ভাগ অবসাদের কারণ হল মনস্তাত্ত্বিক কারণ, এর মানে হল আবেগজনিত কারণ।

কি ধরনের আবেগজনিত কারণে (বা বসে থাকা) কর্মী ক্লান্ত হয়ে থাকেন? আনন্দের আতিশয্যে? মনের খুশিতে? না! কক্ষনো তা নয়! একঘেঁয়েমি, বিরক্তি, যোগ্য সমাদরের অভাব, তুচ্ছতাবোধ, তাড়াহুড়ো, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা-এইগুলোই সেই আবেগজনিত কারণ, যাতে বসে কাজ করা মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয় এবং এর ফলেই সে মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। হ্যাঁ, জেনে রাখুন আমরা ক্লান্ত হই কারণ আমাদের আবেগই আমাদের শরীরে স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

মেট্রোপলিটান জীবন বীমা কোম্পানি অবসাদের উপর একটা পুস্তিকায় বলেছিলেন এই কয়টি কথা : কঠিন পরিশ্রম কখনই কদাচিত ক্লান্তি বা অবসাদ আনতে পারে, যে অবসাদ ভালো নিদ্রা বা বিশ্রামে দূর হয় না...দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর আবেগজনিত গণ্ডগোলই ক্লান্তি বা অবসাদের প্রধান তিনটি কারণ। যখন শারীরিক বা মানসিক কাজের ফলেই এটা হয় তখন এদেরই দোষের কারণ বলা হয়...মনে রাখবেন, টানটান কোনো মাংসপেশীই হল কার্যকর মাংসপেশী। অতএব, সহজ হয়ে উঠুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য শক্তি জমিয়ে রাখুন।

এবারে যেমন অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় থেকে, আপনি নিজেকে একবার পরীক্ষা করে নিন। এই লাইনগুলো পড়তে বইটার দিকে কুটি করছেন না তো? দুচোখের মাঝখানে কোনো মানসিক চাপ বোধ করছেন না তো? আপনার চেয়ারে বেশ আরাম করে বসে আছেন তো? নাকি কাধ কুঁচকে রয়েছেন? আপনার মুখের পেশীগুলি কি টানটান হয়ে আছে? এই মুহূর্তে যদি আপনার সারা শরীর তুলোর পুতুলের মতো সরল আর ঢিলেঢালা না থাকে, তাহলে কোন সন্দেহ নেই এই মুহূর্তে আপনি স্নায়বিক উত্তেজনা আর পেশীর উত্তেজনায় আক্রান্ত। আপনি স্নায়বিক অবসাদ তৈরি করে চলেছেন।

মানসিক কাজ করতে গিয়ে আমরা কেন এই অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা তৈরি করি? জোসেলিন বলেন : 'আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রধান বাধা হল সার্বজনীন এই বিশ্বাস যে কঠিন কাজ করার জন্য চাই চেষ্টার এক চিন্তা, না হলে কাজটি ঠিকমতো হতে চায় না। আর এই কারণেই আমরা মনোযোগ দেয়ার সময় ভুরু কুঁচকে তাকাই। আমরা কাঁধ সঙ্কুচিত করি। আমরা আমাদের পেশীকে আমাদের চেষ্টার মধ্যে গতি আনতে বলি, কিন্তু এসব আমাদের মস্তিষ্ককে কোনোভাবেই আর কাজে সাহায্য করে না।

এখানে আশ্চর্যজনক আর বিয়োগান্ত একটা সত্য উদ্ধৃত করছি : কোটি কোটি মানুষ যারা তাদের টাকা নষ্ট করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না তারাই আবার উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে সেই টাকা আর তাদের শক্তি নাবিকদের মতো উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে উড়িয়ে চলে।

এই স্নায়বিক অবসাদের উত্তর কি রকম? বিশ্রাম! বিশ্রাম! বিশ্রাম! কাজ করে চলার অবসরে বিশ্রাম গ্রহণ করার কৌশল আয়ত্ত করুন।

ব্যাপারটা সহজ! মোটেই না। এটা করতে গেলে আপনাকে হয়তো আপনার সারা জীবনের অভ্যাসকে উল্টোপথে চালনা করতে হতে পারে। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, কারণ এর ফলে আপনার জীবনে হয়তো বা বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। উইলিয়াম জেমস তার 'দি গসপেল অব রিল্যাক্সেশান' প্রবন্ধে বলেছেন : আমেরিকান জীবনে মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেগ, ঝাঁকুনি আর সন্ত্রস্ততা

এবং তারই সঙ্গে প্রকাশের ব্যথা আর তীব্রতা...এর মূল হল আর কিছুই না-খারাপ অভ্যাস।

উদ্বেগ একটা অভ্যাস। বিশ্রামও একটা অভ্যাস। খারাপ অভ্যাস যেমন দূর করা যায়, ভালো অভ্যাস তেমন গড়ে তোলা সম্ভব।

আপনি বিশ্রাম নেন কেমন করে? আপনার মন থেকেই শুরু করেননা স্নায়ু দিয়ে শুরু করেন? আসলে এ দুটোর কোনোটাই দিয়ে তা করেন না। সবসময়েই আপনি আপনার পেশীকে বিশ্রাম দিতে শুরু করুন।

আসুন, একটু চেষ্টা করে দেখি। কী করে এটা হয় দেখাতে গেলে আসুন আপনার চোখ দিয়েই শুরু করা যাক। এই অংশটা ভালো করে পড়ুন, তারপর শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পর একটু হেলান দিয়ে বসে চোখ দুটো বন্ধ করে আপনার চোখকে আস্তে আস্তে বলতে

থাকুন, 'যেতে দাও যেতে দাও। জোর করে কিছু দেখবার দরকার নেই, কুটি করো না। যেতে দাও, যেতে দাও। আরো এক মিনিট আস্তে আস্তে এই রকম করুন...।

আপনি লক্ষ করে দেখেছেন কি কয়েক সেকেন্ড পরেই চোখের পেশীগুলো হুকুম তামিল করতে শুরু করেছেন? আপনার কি মনে হয় নি যেন কোনো অদৃশ্য হাতের স্পর্শে আপনার অবসাদ দূর হতে শুরু করেছে? যাই হোক, আসল রহস্য হল ওই একটা মিনিটের মধ্যেই আপনি বিশ্রাম বা বিনোদনের গোপন রহস্যটা জেনে ফেলেছেন। এটাই মূলকথা। এই সকল একই জিনিস আপনি করতে পারেন আপনার চোয়াল দিয়ে, বা মুখের পেশী, ঘাড় বা কাঁধ দিয়ে, মোটকথা সারা শরীর দিয়ে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হল ওই চোখ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের : এডমন্ড জ্যাকসন তো এমন কি বলেই ফেলেছেন যে, আপনি যদি চোখের পেশীগুলোকে সম্পূর্ণ নমনীয় করে ফেলতে পারেন তাহলে সমস্ত রকম জ্বালা-যন্ত্রণার কথা একেবারেই ভুলে যেতে পারেন! চোখ যে কোনো স্নায়বিক উদ্বেগ দূর করার কাজে এত গুরুত্বপূর্ণ, রিল্যাক্সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে বিশ্রাম তার কারণ হল তারা শরীরের গ্রহণীয় সমস্ত ক্ষমতায় এক-চতুর্থাংশ খরচ করে ফেলে। আর এই কারণেই বহু মানুষ, যাদের দৃষ্টিশক্তি চমৎকার, তাঁরা চোখের টাটানিতে ভোগেন।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ভিকি ব্রাউন বলেন যে তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন কোনো-এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে তিনি তাকে এমন একটা জিনিস শিখিয়ে দেন, যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তিনি আর শোনেন নি। পড়ে গিয়ে আর হাঁটু ছিঁড়ে গিয়েছিল আর কব্জিতেও আঘাত লেগেছিল। বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে তুলে ধরেছিলেন, তিনি এককালে সার্কাসের ক্লাউন ছিলেন। তার পোশাকের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বৃদ্ধ বলেছিলেন : পড়ে গিয়ে তোমার আঘাত লাগার কারণ হল তুমি জানো না কেমন করে নমনীয় হতে হয়।

তোমার ভাব দেখাতে হবে যেন তুমি পুরনো দলা পাকানো মোজার মতই নড়বড়ে আর নরম। এসো, তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি কেমন করে সেটা করতে হয়।'

সেই বৃদ্ধ এরপর শিশু ভিকিকে আর অন্যান্য বাচ্চাদের শিখিয়ে দেন কি করে পড়ে যেতে হয় আর কেমন করে গড়িয়ে গিয়ে ডিগবাজি খেতে হয়। বৃদ্ধ বারবার বলেছিলেন, একটা কথা সবসময় মনে রাখবে তুমি হচ্ছো পুরনো দলা পাকানো মোজা। তারপরই তোমায় নমনীয় হতে হবে।

আপনিও যখন-তখন যে-কোনো মুহূর্তেই এই বিশ্রাম নিতে পারেন। শুধু বিশ্রাম নেয়ার কোন চেষ্টা করবেন না। বিশ্রাম হল সমস্ত রকম উদ্বেগ আর প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি। সহজভাবে ভাববে চেয়ে বিশ্রাম নিন। এটা শুরু করবেন আপনার চোখের আর মুখের পেশী নমনীয় করতে চেয়ে, সঙ্গে বারবার বলতে থাকবেন সব চলে যাক...চলে যাক,...বিশ্রাম চাই। আপনার মুখের পেশী বেয়ে অনুরণকে শরীরের অভ্যন্তরে থামতে অনুভব করতে থাকুন। শিশুর মতো সবরকম উদ্বেগমুক্ত বলে নিজেকে ভাবতে থাকুন।

ঠিক এই রকমই করতেন বিখ্যাত গায়িকা গ্যাল্লি কুর্চি। হেলেন জেপসন নামে একজন মহিলা আমাকে একবার বলেছিলেন যে তিনি কোনো অনুষ্ঠানের ঠিক আগে গ্যাল্লি কুর্চিকে একটা চেয়ারে সমস্ত পেশী এলিয়ে দিয়ে বসে থাকতে দেখেছেন। তার চোয়াল প্রায় মুখে পড়ত তখন। ভারি চমৎকার অভ্যাস এটা-এটা তাঁকে মঞ্চে প্রবেশের আগে সব উদ্বেগ আর স্নায়বিক দুর্বলতা মুক্ত করে দিত, এটা তার অবসাদও দূর করত।

শরীরে শিথিলতা এনে বিশ্রাম করার জন্য নিচের পাঁচটি উপদেশ মেনে চলতে পারেন :

এক. এ বিষয়ে কিছু ভালো বই পড়তে পারেন, যেমন : ডেভিড হ্যারল্ড ফিঙ্কের স্নায়বিক উদ্বেগ থেকে মুক্তি। এছাড়াও আছে ড্যানিয়েল ডব্লিউ. জোসেলিনের লেখা 'কেন ক্লান্ত হন' বইখানা।

দুই. যখন-তখন বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করুন। পুরনো মোজার মতো নিজেকে শিথিল করে ফেলুন। আমি আমার কাজের টেবিলে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য একটা পুরনো মোজা রেখে দিই। এছাড়া বিড়ালের কথাটাও মনে রাখবেন। ঘুমন্ত বিড়ালছানা কখনো হাতে নিয়ে দেখেছেন? তুলে নিয়ে দেখবেন কেমন তুলোর বস্তার মতো লাগে। যোগীরাও বলেন, বিশ্রামের কৌশল আয়ত্ত করতে হলে বিড়ালের চালচলন লক্ষ্য করবেন। আমি কোনোদিন অবসাদে ভেঙে পড়া বিড়াল দেখি নি।

তিন. বেশ আরাম করে বসে যতটা পারেন কাজ করবেন। মনে রাখবেন, শরীরে উদ্বেগ থাকলে কাঁধ ব্যথা হয় আর অবসাদ আসে।

চার দিনের মধ্যে চার কি পাঁচ বার নিজেকে পরীক্ষা করুন আর নিজেকে প্রশ্ন করুন : 'আমি কি বেশি পরিশ্রম করছি? যে কাজে পেশীর প্রয়োজন নেই তাতে কি তাই কাজে লাগাচ্ছি?' এটা আপনাকে বিশ্রামের কৌশল আয়ত্ত করতে শেখাবে।

পাঁচ. এরপর দিনের শেষে নিজেকে আবার প্রশ্ন করুন : 'আমি কতখানি ক্লান্ত? আমি যদি ক্লান্ত হই সেটা আমার মানসিক কাজের বা পরিশ্রমের জন্য নয়, বরং আমি যেভাবে করেছি সেইজন্যেই। ড্যানিয়েল ডব্লিউ. জোসেলিন বলেন : 'আমি দিনের শেষে নিজেকে প্রশ্ন করি না আমি কতখানি ক্লান্ত বরং জানতে চাই আমি কতটা ক্লান্ত নই। আমি যখন

দিনের শেষে কোনোভাবে অবসাদগ্রস্ত বলে নিজেকে ভাবি বা কোনোরকম বিরক্তি আসে আর বুঝি আমার স্নায়ু ক্লান্ত, তখন বুঝতে পারি ভালোভাবেই কাজটা বেশি করেই করেছি, যোগ্যতারও অভাব ছিল। ব্যবসাদারদের প্রত্যেকে যদি এটা খেয়াল রাখতেন তাহলে হয়তো উচ্চ রক্তচাপের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে আসত। এছাড়াও স্যানাটোরিয়াম আর উন্মাদাশ্রমে মানুষের সংখ্যাও কম হত।

৪. যে বিরক্তি ক্লান্তি দুশ্চিন্তা আর নিরাশ্য আনে তাকে নির্বাসন দেয়া দরকার

অবসাদের অন্যতম প্রধান কারণ একঘেঁয়েমি। উদাহরণ হিসেবে একজনের নাম বলতেই হয়। ধরুন, এলিসের কথাটাই। আপনারই বাড়ির কাছে সে থাকে। পেশায় সে স্টেনোগ্রাফার। একরাতে সে বাড়ি ফিরল অবসাদে প্রায় ভেঙে পড়ে মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে। মায়ের অনুরোধে সে খেতে বসল কিন্তু খেতে পারলে না। তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। ওর এক বয় ফ্রেন্ড ফোন করছিল! সে নাচের আসরে যেতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আনন্দে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এলিসের। ওর মন চনমনে হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে পোশাক পালটে ও ছুটল। এরপর রাত তিনটে পর্যন্ত নাচ গান করে বাড়ি ফিরল এলিস-ক্লান্তির কোনো চিহ্নই ছিল না। ওর এমন আনন্দ হচ্ছিল যে ঘুম আসছিল না।

তাহলে কি আট ঘণ্টা আগে এলিস ক্লান্ত ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। সে অবসাদে ভেঙে পড়ছিল কারণ নিজের কাজে ওর একঘেয়েমি এসেছিল। এরকম আরো হাজারও এলিসকে খুঁজে পাওয়া যাবে। আপনিও এদের মধ্যে একজন হতে পারেন।

এটা সত্য যে, আপনার আবেগজনিত মনোভাবই শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে অবসাদ সৃষ্টির জন্য বেশি দায়ী। কয়েক বছর আগে জোসেফ ই. বারম্যাক আর্কাইভস অব সাইকোলজি'-তে এক প্রবন্ধে বুঝিয়েছিলেন একঘেঁয়েমি কেমন করে অবসাদ সৃষ্টি করে।

একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি এটা জানান। ড. বারম্যাক কিছু ছাত্রকে কোনো এক পরীক্ষার কাজে লাগিয়েছিলেন সেটায় তিনি জানতেন তাদের কণামাত্রও আগ্রহ ছিল না। ফলাফল কি হল? ছাত্ররা অভিযোগ করল তারা অবসাগ্রস্ত, মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত, চোখ টাটানিতে বিরক্ত আর তাদের ঘুম পাচ্ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের পেটেরও গণ্ডগোল হয়। সবটাই কি কম্পিত? না। বিপাকীয় পরীক্ষায় দেখা যায় যে, শরীরে রক্তের চাপ আর অক্সিজেন গ্রহণ কোনো মানুষ একঘেঁয়ে বোধ করলেই কমতে থাকে। অথচ সে কাজে আগ্রহ আর আনন্দ বোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিপাকীয় ক্রিয়া বেড়ে যায়।

আমরা যখন পছন্দসই আর উত্তেজনাময় কাজ করি, তখন কদাচিত আমরা অবসাদ গ্রস্ত হই। উদাহরণ হিসেবে ধরুন, আমি কিছুদিন আগে কানাডিয়ান রকি পর্বত এলাকার লুইজি হ্রদ অঞ্চলে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। সেখানে বেশ কিছুদিন আমি প্রবাল খাড়ি বরাবর মাছ ধরেছিলাম। এই আনন্দ করতে গিয়ে আমার মাথার চেয়েও উঁচু সব ঝোঁপের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলেছি, গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়েছি–অথচ আট ঘণ্টার টানা পরিশ্রম করার পরেও এতটুকুও ক্লান্ত হই নি। এমন হওয়ার কারণ কি? কারণ হল উত্তেজনা আর দারুণ আনন্দে ছিলাম। দারুণ কাজ করেছি বলে আমি ভাবছিলাম। মস্ত আকারের ছ'টা ট্রাউট মাছ ধরেছিলাম। ধরুন, যদি মাছ ধরতে ধরতে আমার একঘেয়েমি আসত, তাহলে আমার মনোভাব কেমন হত? তাহলে এমন পরিশ্রমের পর সাত হাজার ফিটের উপর আমাকে অবশ্যই অবসাদে ভেঙে পড়তে হত।

পাহাড়ে চড়ার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজে একঘেঁয়েমিই পরিশ্রমের চেয়ে ঢের বেশি অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : মিনিয়াপোলিশের মি. এস. এইচ. কিংম্যান ব্যাপারটা আমাকে জানান। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে কানাডা আলপাইন

ক্লাবকে প্রিন্স অব ওয়েলস রেঞ্জার্সের কিছু সৈন্যকে পর্বতারোহণ শেখানোর জন্য কিছু পথপ্রদর্শক দিতে অনুরোধ জানায়। মি. কিংম্যান ছিলেন ওই সৈন্যদের পর্বতারোহণ শেখানোর একজন শিক্ষক আর গাইড। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ওইসব গাইডদের বয়স ছিল বিয়াল্লিশ থেকে ঊনষাট বছর-তারা ওইসব তরুণ সৈন্যদের হিমবাহ আর তুষার ভ্রুপের উপর দিয়ে প্রায় চল্লিশ ফুট খাড়া চূড়োতেও নিয়ে যান। সেখানে তাদের ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পথে যেতে হয়, কোনো রকমে পা রাখা যায় এমন পথেও উঠতে হয়। তারা কানাডিয়ান রকি পর্বতের উচ্চ শিখরে তার নাম করণ হয় নি এমন সব শিখরেও ওঠেন। কিন্তু পনের ঘণ্টা ধরে এই পর্বতারোহণের পর স্বাস্থ্যবান তরুণ সৈন্যরা (যারা প্রায় ছ'মাস কঠিন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করেছিল। প্রায় অবসাদে ভেঙে পড়ে।

ওদের ওই অবসাদ কি আগেকার কঠিন শিক্ষায় মজবুত না হয়ে ওঠা পেশীর জন্য? যারা কমান্ডো ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন তারা কথাটা শুনে হেসে উঠবেন! না, তাঁরা অবসাদ গ্রস্ত হয়েছিল পাহাড়ে চড়ার একঘেঁয়েমির জন্য। তাদের কেউ কেউ এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে খাবার জন্য অপেক্ষা না করেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের পথপ্রদর্শকরা যারা সৈন্যদের চেয়ে বয়সে দুই বা তিনগুণ বড়-তারাও কি ক্লান্ত হয়? হ্যাঁ, তারা ক্লান্ত হলেও ভেঙে পড়ে নি। তারা নৈশভোজ সেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব করে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করে চলেছিল। তারা ভেঙে পড়ে নি কারণ তাদের আগ্রহ ছিল।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ব্রডওয়ার্ড থর্নডাইক অবসাদ নিয়ে পরীক্ষা করার সময় কিছু তরুণকে প্রায় এক সপ্তাহ ঘুমোতে দেন নি, নানা উৎসাহজনক কাজে ব্যস্ত রেখে। নানা

রকম পরীক্ষার পর তিনি ঘোষণ করেন : একঘেঁয়েমিই হল কাজে উৎসাহ কমে আসার কারণ।

আপনি মানসিক পরিশ্রম করে থাকেন, তাহলে আপনার কাজে পরিমাণ আপনাকে অবসাদ গ্রস্ত করে তোলে না। যে কাজ আপনি করেন না তাই আপনাকে ক্লান্ত অবসাদময় করে তুলতে পারে। যেমন ধরুন, গত সপ্তাহের কথাটাই, সে সময় আপনি হয়তো বারবার বাধা প্রাপ্ত হন। কোনো কাজ শেষ হয় নি, চিঠির জবাব দেয়া হয় নি, সাক্ষাত করা যায় নি। সবই কেমন গোলমেলে হয়ে যায়। কিন্তু আপনি সেদিন কিছু না করেও বাড়ি ফিরলেন ক্লান্ত হয়ে মাথায় যথেষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে।

অথচ পরের দিন অফিসে সবই চমৎকার কাজকর্ম হয়। আগের চল্লিশ গুণ বেশি কাজ করেন আপনি। তা সত্ত্বেও ঝকঝকে সাদা টাটকা গার্ডেনিয়া ফুলের মতো হয়েই বাড়ি ফিরলেন। আপনার এ রকম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই হয়েছে। হয়েছে আমারও।

এ থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছি আমরা? এই শিক্ষা যে, আমাদের অবসাদ আসে কাজের জন্য নয় বরং ভাবনা, চিন্তা, হতাশা আর বিরক্তি থেকে।

এই পরিচ্ছেদ লেখার সময় আমি জেরোম কার্ণের সংগীত বহুল ‘শো বোট’ নাটকটি দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকের নায়কের মুখে শোনা যায় : ‘একমাত্র ভাগ্যবান তারাই যারা কাজ করে আনন্দ পায়। এরকম মানুষেরা ভাগ্যবান এই জন্যই যে তাদের রয়েছে অনেক বেশি ক্ষমতা, কম উদ্বেগ আর কম অবসাদ।

কিন্তু এসব কথা জেনে লাভ কি? আপনার এতে করার আছেই বা কি? একজন স্টেনোগ্রাফারের কথা বলছি–ওকলাহোমার টুলসার এই স্টেনোগ্রাফার কি করেছিল শুনুন। তাকে সারা মাস ধরেই একঘেঁয়েমি ভরা কাজ করতে চলতে হত। তার কাজ ছিল কাগজপত্র গোছানো, চিঠিপত্র তৈরি রাখা, এই সব। অত্যন্ত একঘেঁয়ে কাজ বলে সে একদিন নিজে বাঁচার জন্যেই কাজটা একটা আনন্দময় করবে বলে ভেবে নিল। নিজে নিজেই সে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ফেলল। প্রতিদিন সকালে কতগুলো ফর্ম সে তৈরি করত সেগুলো গুণে রাখতে শুরু করল। তারপর সেই সংখ্যা বিকেলের দিকে যাতে অতিক্রম করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল। সে প্রতিদিনের কাজের হিসেব রেখে পরদিন যাতে অতিক্রম করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল। সে প্রতিদিনের কাজের হিসেব রেখে পরদিন সেটা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করল। এর ফল কেমন হয়েছিল? সে অল্প কয়দিনের মধ্যেই ওর দপ্তরের বাকি স্টেনোগ্রাফারের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে ফেলতে লাগল। কিন্তু তাতে তার কি হল? সে প্রশংসা লাভ করল, না...ধন্যবাদ পেল? না,...পদোন্নতি ঘটল? না।...মাইনে গেল? তাও, না?...তবে এর ফলে তার অবসাদের ভাব কেটে গেল। সে পেল সেই একঘেঁয়েমি ভরা কাজ থেকে মানসিক আনন্দ এবং আরো শক্তি, আনন্দ আর অবসর যাপনের সুখ।

গল্পটা যে সত্যি সেটা আমার জানা, কারণ ওই মেয়েটিকেই আমি বিয়ে করেছি।

আরো একজন স্টেনোগ্রাফারের গল্প শোনাচ্ছি। তিনিও একঘেঁয়েমি ভরা কাজকে আনন্দময় করতে চেষ্টা চালিয়ে সফল হন। তিনি আমাকে নিজের কাহিনী লিখে জানিয়ে ছিলেন। সেটা তার নিজের ভাষাতেই বলছি :

‘আমাদের অফিসে স্টেনোগ্রাফারের সংখ্যা হল চারজন। চারজন নানাজনের চিঠিপত্র দেখাশোনা করে। আমাদের কাজের চাপে মাঝে মাঝে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। একবার একজন সহকারী অধিকর্তা আমাকে একটা বড় চিঠি টাইপ করার কথা বলেন। আমি আপত্তি জানিয়ে বলি কয়েকটা কথা শুধরে নিলেই কাজ চলতে পারে। নতুন করে টাইপ করতে হবে না। ভদ্রলোক আমাকে দুকথা শুনিয়ে জানালেন আমার ইচ্ছে না থাকলে অন্য কাউকে দিয়েই তিনি টাইপ করিয়ে নেবেন। প্রচণ্ড রাগ করেই আমি চিঠিটা নিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল আমার জায়গায় থেকে কাজ করতে পারলে অনেকেই ধন্য। হতে। তাছাড়া ঠিক এই রকম কাজ করার জন্যেই আমাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। এরপরেই ভালো বোধ করতে লাগলাম। আচমকা মন ঠিক করে ফেললাম, যেন ভালো লাগে এমন মনোভাব নিয়ে এবার থেকে কাজ করব-যদিও মনে মনে আমার ঘৃণাই হত। তারপরেই আমি এই দারুণ দরকারী জিনিস আবিষ্কার করে বসলাম। আমি যদি কাজটা ভালোবাসি মনে করে কাজ করে যাই, তাহলে কিছুটা ভালো করে কাজ করতে পারবো। অতএব, আমাকে কদাচিৎ বাড়তি কাজ করার দরকার হত। আমার এই নতুন পদ্ধতির ফলে বালো কর্মচারি হি সবে আমার সুনাম হল। এরপর যখন একজন বিভাগীয় সুপারিন্টেডেন্টের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির দরকার হল তিনি আমাকেই চাইলেন, কারণ তাঁর মতে, আমি অসন্তুষ্ট না হয়ে বাড়তি কাজ করতে চাই এবং ঠিক এমনটাই তার দরকার। এই ভাবে শুধু মানসিক চিন্তাধারা বদলের ফলেই দারুণ কিছু ঘটে গেল। এ এক দারুণ আবিষ্কার। অদ্ভুত কিছুই এতে ঘটেছে।

কয়েক বছর আগে হারল্যান এ. হাওয়ার্ড এমন একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাতে আর জীবনের ধারাই সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তিনি নীরস একটা কাজকে সরস করতে চেষ্টা করেন। সত্যিই তার কাজটা একঘেঁয়েমিতে ভরা ছিল–প্লেট সাফ করা, কাউন্টার ধোলাই

করা, উঁচু ক্লাসের খাওয়ার ঘরে আইসক্রিম সররাহ করা ইত্যাদি যখন করত, তখন অন্য ছেলেরা খেলাধুলোয় বা মেয়েদের সঙ্গে খুনসুটি করতে ব্যস্ত। হারল্যান হাওয়ার্ড মনে প্রাণেই তার কাজকে ঘৃণা করত। কিন্তু কাজটা যখন তাকে করে যেতেই হবে, তখন সে আইসক্রিম কি দিয়ে তৈরি সেটা জানবে বলে ঠিক করে ফেলল। তাছাড়া একটা আইসক্রিম আর একটা চেয়ে কেনই বা ভালো। সে আইসক্রিমের রসায়ন পড়তে শুরু করল আর পরে দক্ষতাও অর্জন করল। খাদ্য রসায়ন সম্পর্কে তার আগ্রহ এতই বেড়ে উঠল যে, শেষপর্যন্ত সে ম্যাসাচুসেটস্ স্টেট কলেজে ভর্তি হল। এরপর যখন নিউইয়র্ক কোকো এক্সচেঞ্চ, কোকো আর চকোলেট সম্বন্ধে একশ ডলার পুরস্কার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করল কলেজ ছাত্রদের জন্য-কে জয়ী হল জানেন? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। হারল্যান হাওয়ার্ড।

কাজকর্ম জোগাড় করতে না পেরে সে তার বাড়ি ম্যাসাচুসেটসের আমহার্স্টের ৭৫০ নর্থ প্লেজান্ট স্ট্রিটে একটা ছোট্ট গবেষণাগার খুলল। কিছুদিনের মধ্যে দেশে একটা নতুন আইন চালু হল যে দুধের মধ্যেকার জীবাণু গুনতে হবে। হারল্যান হাওয়ার্ডকে কিছুদিনের মধ্যেই আমহার্স্টের অন্তত কুড়িটা প্রতিষ্ঠানের দুধের জীবাণু গোনার কাজে দেখা গেল। তাকে দুজন সহকারীও রাখতে হল।

পঁচিশ বছর পরে এই ছেলেটির কি হবে জানেন? এখন যারা ব্যবসা পরিচালনা করে চলেছেন সেই সব মানুষ ততদিনে অবসর নেবেন বা হয়তো পরলোকে যাবেন, আর তাদের স্থান নেবেন আজকের হাস্যোজ্জ্বল কর্মচঞ্চল তরুণ ছেলেরাই। পঁচিশ বছর পরে আজকের হারল্যান হাওয়ার্ড হয়ে উঠবে তার পেশায় একজন অতি বিখ্যাত মানুষ, অন্যদিকে তার সহপাঠিরা, যাদের সে আইসক্রিম বিক্রি করত তারা হয়তো বেকার

থেকে সরকারকে অভিসম্পাত দিয়ে চলবে। হারল্যান এ, হাওয়ার্ডও হয়তো কোনো সুযোগ পেত না যদি-না সে একটা একঘেঁয়েমি ভরা কাজকে আনন্দময় করে তুলতে চাইত।

বেশ কয়বছর আগে আর একজন তরুণও তার কাজ নিয়ে একঘেঁয়েমিতে আক্রান্ত হয়েছিল। তার কাজ ছিল কারখানার লেদ মেশিনে বল্ট তৈরি করা। ছেলেটির নাম ছিল শ্যাম। কাজ ভালো লাগত না বলেই শ্যাম কাজ ছেড়ে পালাতে চাইত, কিন্তু তার ভয় ছিল অন্য কাজ যদি না পায়। কাজটা তাই করে যেতে হবে বলেই শ্যাম ঠিক করল কাজকে আনন্দময় করে তুলতে হবে এই ভেবেই সে তার পাশের মেশিন চালকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। দুজনে পাল্লা দিয়ে বল্ট বানাতে শুরু করল। দুজনে দেখত কে বেশি বানিয়েছে। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা ফোরম্যানের নজরে পড়ল। তিনি শ্যামের কাজের গতিতে দারুণ খুশি হয়ে তাকে আরো ভালো কাজে লাগালেন। এই হল পরপর কতকগুলো পদোন্নতির শুরু। ত্রিশ বছর পরে, শ্যাম-স্যামুয়েল ভকলেন–হলেন বল্ডুইন লোকোমোটিভ ওয়াকসের প্রেসিডেন্ট। তিনি সারাজীবন ধরেই ওই মেকানিক থেকে যেতেন, যদি না নিজের কাজকে আনন্দময় করে তুলতে চাইতেন।

বিখ্যাত বেতার সংবাদ ঘোষক এইচ. ভি. ক্যাপ্টেনবর্ন একবার আমাকে বলেন, কীভাবে তিনি নীরস একটা কাজকে আনন্দময় করে তোলেন। তার বাইশ বছর বয়সের সময় তিনি জাহাজে আটলান্টিক পাড়ি দেন। কিছু গবাদি পশুর তদারকির কাজ করেন। বাইসাইকেলে ইংল্যান্ডে পরিক্রমার পর প্যারি শহরে পৌঁছান ক্যাপ্টেনবর্ন। নিজের ক্যামেরা মাত্র পাঁচ ডলারে বাঁধা রেখে তিনি প্যারির সংস্করণ নিউইয়র্ক হেরাল্ডে একটা কাজের আবেদন করে বিজ্ঞাপন দেন। কাজও একটা জুটে যায়–ছবির দেখার

স্টিরিওস্কোপ মেশিন বিক্রির। মেশিনের কথাটা বয়স্ক লোকেরা সবাই জানেন দুটো ছবি ঘোরাতে থাকলে একটা হয়ে ত্রিস্তর ছবি হয়ে উঠে।

ক্যাল্টেনবর্ন শেষপর্যন্ত ওই মেশিন প্যারির দরজা দরজায় ঘুরে বিক্রি করতে শুরু কররেন-অসুবিধাও ছিল কারণ ফরাসিতে তিনি কথা বলতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি প্রথম বছরেই পাঁচ হাজার ডলার কমিশন পেয়ে সে বছরে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি আয়ের বিক্রেতা হয়ে উঠলেন। ক্যাপ্টেনবর্ন আমাকে জানিয়ে ছিলেন, এমন কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল একটা মাত্র কারণেই-আর সেটা হল আত্মবিশ্বাস। হার্ভার্ডে এক বছর পড়াশুনা করার ফলেই এই আত্মবিশ্বাস তাঁর মধ্যে জন্ম নেয়।

তাহলে ফরাসি ভাষা না জানা সত্ত্বেও এ আত্মবিশ্বাস তার এলো কি করে? আসলে কীভাবে বিক্রির সময় কথাগুলো বলতে হবে সেটা তার নিয়োগকর্তা ফরাসিতে তাঁকে লিখে দেয়ার পর তিনি সেটা মুখস্ত করে রাখেন। কোনো বাড়ির দরজায় ঘন্টা বাজিয়ে দিতে গৃহকর্ত্রী দরজা খুললে, ক্যাপ্টেনবর্ন সুন্দর উচ্চারণে সেই মুখস্থ করা ফরাসিতে কথা বলে মেশিনটা ইঙ্গিত করতেন আর ছবিও দেখাতেন। গৃহকর্ত্রী বাড়তি প্রশ্ন করলে তিনি শুধু টুপি তুলে বলতেন আমেরিকান...আমেরিকান আর সঙ্গে লেখা সেই ফরাসি লেখাও দেখিয়ে দিতেন। গৃহকর্ত্রীরা আমোদ পেয়ে হাসতেন আর তার কাজও সমাধা হয়ে যেত। ক্যাল্টেনবর্ন নিজেই স্বীকার করছেন কাজটা আদৌ সহজ ছিল না। তাহলে তার সাফল্যের কারণ কি? একটাই-নিজের কাজ সমাধা করার অদম্য উৎসাহ আর আনন্দময় করে তোলো। প্রতিদিন সকালে বাইরে বেরোনোর আগে তিনি একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন : ক্যাপ্টেনবর্ন, যদি খেতে চাও তাহলে এ কাজ তোমাকে করতেই হবে। আর করতে যখন হবেই তখন আনন্দেই সে কাজ করো না

কেন? নিজেকে কোনো অভিনেতা ভেবে নাও আর মনে করো কোনো মজাদার চরিত্রেই অভিনয় করছ।'

মি. ক্যাপ্টেনবর্ন নিজে আমাকে বলেছেন, প্রতিদিনের ওই স্বগতোক্তি তাঁকে যে কাজ একদিন ঘৃণা করত তাতেই সফল হতে সাহায্য করেছে। আমেরিকান তরুণদের কাছে তার পরামর্শ হল, প্রতিদিন কাজে নামা চাই। শারীরিক ব্যায়ামের মতো আমাদের দরকার মানসিক কিছু ব্যায়ামও। তাই প্রতিদিন কিছু স্বগতোক্তি করা ভালো।'

এটা কি কোনো হাস্যকর ব্যাপার? মোটেই না। এটা সম্পূর্ণ মনোবিদ্যার ব্যাপার। আমাদের জীবন হল আমাদের মন যা তৈরি করে, আমরা ঠিক তাই। ঠিক মতো চিন্তার মধ্যে দিয়েই যে-কোনো কাজ আপনি কম নীরস করে তুলতে পারেন। শুধু ভাবতে চেষ্টা করুন, কাজকে আনন্দময় করে তুলতে পারলে তার বদলে কি পাবেন আপনি। একবার ভাবুন, এতে আপনার জীবনের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে উঠতে পারে, কারণ আপনি আপনার জাগ্রত থাকার সময়ের শুধু অর্ধেকটাই কাজে ব্যয় করেন। মনে রাখার চেষ্টা করুন, আপনার কাজকে আনন্দময় করে তুললে তাতে পদোন্নতি বা আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর তা না। হলেও অন্তত আপনার দৈনন্দিন অবসাদ দূর হয়ে আনন্দের পরশ পেতে পারেন।

৫. আপনার যা আছে তার মূল্য লক্ষ ডলার

আমি হ্যারল্ড অ্যাবটকে বহু বছর ধরেই চিনি। তিনি ৮২০ সাউথ ম্যাডিসন অ্যাভিনউ, মিসৌরির ওয়েব সিটিতে থাকেন। তিনি আমার বক্তৃতার ম্যানেজার ছিলেন। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় কানসাস সিটিতে। তিনি আমাকে তাঁরই গাড়িতে আমার বেলটনের খামারে পৌঁছে দেন। পথ চলতে চলতে আমি তাকে প্রশ্ন করি–উদ্বেগকে তিনি কেমন করে সরিয়ে রাখেন? উত্তরে তিনি এমন একটা উদ্বুদ্ধ করা গল্প শোনানা যা কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

তিনি বলেন, আমি আগে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা করতাম, তবু ১৯৩৪ সালের বসন্তকালে একদিন ওয়েব সিটির ওয়েস্ট ডুহাটি বরাবর বোড়ানোর সময় এমন একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়ল যাতে আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। মাত্র দশ সেকেন্ডে ব্যাপারটা ঘটে যায়। কিন্তু ওই দশ সেকেন্ডে আমি যা শিখেছিলাম দম বছরেও তা পারি নি।

‘বিগত দু’বছর ধরে ওয়েব সিটিতে আমি একটা মুদিখানার দোকান চালিয়ে আসছিলাম। কাজটা করতে গিয়ে আমার সর্বস্ব যে হারাই তাই নয়, এমন ঋণগ্রস্ত হই যে সেটা শোধ করতে ৭ বছর লেগে যায়। আমার মুদি দোকান গত শনিবার থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, আর এখন আমি চলেছি ব্যাংকে কিছু টাকা ধার করতে যাকে কানসাস সিটিতে গিয়ে একটা চাকরির খোঁজ করতে পারি। পরাজিত এক মানুষের মতোই আমি চলেছিলাম। তখনই আচমকা আমার নজরে পড়ল, একজন লোক আসছে যার দুটো পা নেই। সে একটা ছোট স্কেটিং করার চাকা লাগানো কাঠের তক্তায় বসে হাতে একখণ্ড কাঠ দিয়ে

সেটা ঠেলে নিয়ে আসছিল। সে লোকটি রাস্তা পার হওয়ার ঠিক পরেই তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। সে চমৎকার হাসি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। সুপ্রভাত স্যার, অতি চমৎকার সকাল তাই না? তার দিকে তাকাতেই আমার মনে খেলে গেল–আমি কতখানি ভাগ্যবান। আমার দুটো পা আছে, আমি হাঁটতে পারি। আমার নিজের উপর ধিক্কার দেয়ার জন্য লজ্জিত বোধ করলাম। আমি আমার নিজেকেই বললাম, ও যদি ওর দুটো পা না-থাকা সত্ত্বেও সুখী, আনন্দিত আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকতে পারে তাহলে পা নিয়ে আমি নিশ্চয়ই পারব। ইতিমধ্যেই আমি বুকে জোর পেতে শুরু করেছিলাম। আমি ব্যাংকের কাছ থেকে একশ ডলার ধার নেব ভেবেছিলাম, এখন টিক করলাম দুশো ডলার নেব। আগে ভেবেছিলাম টাকা নিয়ে কানসাস সিটিতে গিয়ে একটা চাকরির চেষ্টা করব। এখন ঠিক করে দৃঢ় নিশ্চিত হলাম সেখানে গিয়ে একটা চাকরি পাবই। আমি ধারও পেলাম আর চাকরিও পেলাম।

এখন আমার বাথরুমের আয়নার উপর নিচের কথাগুলো সেঁটে রাখা আছে। এগুলো প্রতিদিন সকালে দাড়ি কামানোর সময় আমি পাঠ করি :

‘একদিন আমার জুতো ছিল না বলে মন খারাপ ছিল,
সে দুঃখ দূর হয়ে গেলো রাস্তায় যখন দেখলাম একজন মানুষের
দুটো পা নেই।’

আমি একবার এডি রিকেন ব্যাকারকে প্রশ্ন করেছিলাম, প্রশান্ত মহাসাগরে অসহায়ভাবে সঙ্গীদের নিয়ে একটা ভেলায় চড়ে একুশ দিন ভেসে বেড়িয়ে কি পেয়েছেন তিনি। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ওই অভিজ্ঞতা থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা আমি পাই তা হল, যদি

আপনার ইচ্ছেমতো যথেষ্ট খাওয়ার পানি থাকে, ইচ্ছেমতো খাওয়ার জন্য খাদ্যও থাকে তাহলে কোনো ব্যাপারেই কখনো অনুযোগ জানানো উচিত নয়।

টাইম পত্রিকায় একবার গয়াদাল কানালে আহত এক সার্জেন্টের গল্প বেরিয়েছিল। গোলার টুকরো গলায় লেগে সে আহত হওয়ার পর তাকে রক্ত দিতে হয়। সে ডাক্তারকে একটা চিরকুট পাঠিয়ে প্রশ্ন করে : 'আমি কি বাচব?' ডাক্তার জবাব দেন, 'হ্যাঁ'। সে এবার লেখে : 'আমি কি কথা বলতে পারব?' এবারও উত্তর এলো, হ্যাঁ। সে তখন আর একটা চিরকুট পাঠাল : তাহলে এত ভাবনায় পড়ছি কেন?

আপনিও ঠিক এভাবে নিজেকেই প্রশ্ন করতে পারেন : 'আমিই বা এত দুশ্চিন্তা করছি কেন? হয়তো একটু ভাবলেই দেখতে পাবেন চিন্তার কারণটা সত্যিই অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের জীবনে শতকরা নব্বই ভাগ ব্যাপারই ঠিক আর মাত্র দশ ভাগই ভুল। আমরা যদি সুখী হতে চাই তাহলে আমাদের যে শতকরা নব্বই ভাগ ঠিক তার উপরেই নজর রাখতে হবে, বাকি দশ ভাগ ভুলকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

অন্যদিকে দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ে যদি পাকস্থলীর আলসারে আক্রান্ত হতে চাই তাহলে ওই শতকরা দশ ভাগের উপরেই নজর দিয়ে নব্বই ভাগকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

ক্রমওয়েলের আমলের ইংল্যান্ডের বহু গির্জায় 'চিন্তা করুন ও ধন্যবাদ জানান' কথাগুলো খোদাই কথা আছে। এই কথাগুলো আমাদের হৃদয়ে গেঁতে রাখা উচিত। আমরা যে যে জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞ হতে পারি সে কথাই চিন্তা করা দরকার আর আমাদের সমস্ত রকম সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।

গ্যালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তের লেখক জোনাথন সুইফটই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে সাংঘাতিক নিরাশাবাদী। তিনি এতই দুঃখিত থাকতেন যে, তিনি সবসময় কালো পোশাক পরতেন আর নিজের জন্মদিনে উপবাস পর্যন্ত করতেন। অথচ তা সত্ত্বেও হতাশায় ভেঙে পড়েও ইংরেজি সাহিত্যের অত বড় নিরাশাবাদীও আনন্দিত আর সুখী থাকার স্বাস্থ্যদায়িনী ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাক্তার বলেন, ডাক্তার কম খাওয়া, ডাক্তার শান্ত থাকা আর ডাক্তার আনন্দ।

আপনি বা আমি ওই ডাক্তার আনন্দকে প্রতিটি ঘণ্টাই আমাদের কাছে রাখতে পারি শুধু আমরা যদি মনে করি আমাদের অফুরান ঐশ্বর্য-যে সম্পদের পরিমাণ আলিবাবার ধনরত্নের গুহাকেও হার মানতে পারে। কোটি টাকা পেলে আপনি কি আপনার চোখ দুটো বিক্রি করতে পারবেন? পারবেন আপনার পা বিক্রি করে দিতে? আপনার হাত? আপনার শ্রবণ শক্তি? আপনার সন্তানদের? আপনার পরিবার? সব সম্পদ যোগ করে দেখুন, তাহলেই দেখতে পাবেন রকফেলার, ফোর্ড অথবা মর্গ্যানদের সংগৃহীত সমস্ত সোনার বদলেও আপনি এগুলো বিক্রি করতে পারবেন না।

কিন্তু আমরা কি এটার কথা ভাবি কখনো? ওহ্, না। সোপেনহাওয়ার যেমন বলেছিলেন : 'আমাদের যা আছে তার কথা আমরা কদাচিত্র ভেবে থাকি বরং অধিকাংশ সময় চিন্তা করি যা আমাদের নেই।' এটাই হল এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিয়োগান্ত ব্যাপার। এটাই

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধ আর রোগের যত দুঃখের সৃষ্টি করেছে তারচেয়ে বেশি দুঃখ এনেছে এই ধরনের চিন্তা।

ঠিক এই চিন্তাই জন পামারকে সুস্থ মানুষ থেকে খুঁতখুঁতে স্বভাবের এক বৃদ্ধে বদলে দেয়। আর তার সংসার প্রায় ভাঙার মুখে এনে দাঁড় করায়। এটা আমার জানা কারণ তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন।

মি. পামার নিউ জার্সির প্যার্টারজের ১৯ অ্যাভিনিউতে থাকতেন। তাঁর নিজের কথায় বলি : 'সৈন্যবাহিনী ছেড়ে আসার ঠিক পরেই আমি একটা ব্যবসা শুরু করি। সারাদিন রাতই পরিশ্রম করতাম। সবই বেশ চমৎকার চলছিল। তারপরেই গণ্ডগোল শুরু হল। আমি ব্যবসার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজারে পাচ্ছিলাম না। ভয় হল ব্যবসা হয়তো বন্ধ করেই দিতে হবে। আমার দুশ্চিন্তা এমনই বেড়ে গেল যে, সুস্থ মানুষ থেকে খিটখিট বুড়ো হয়ে গেলাম। তাছাড়া আমি এমনই খিটখিটে আর রাগী হয়ে পড়লাম যে তখনো বুঝতে পারি নি আমার সুখের সংসারটাই ভাঙতে বসেছে। তখন একদিন আমার এক পুরনো প্রতিবন্ধী কর্মচারি আমাকে বলল, 'বন্ধু', তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন পৃথিবীতে একমাত্র তোমারই যত সমস্যা আছে। হয়তো কিছুদিন ব্যবসার দরজা বন্ধ রাখতে হবে–তাতে হলটা কি? আবার সব ভালো হলে নতুন করে শুরু করতে পারবে। তোমার যা আছে তাতে তোমার আল্লাহকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। না সত্ত্বেও তুমি খালি অনুযোগ জানাচ্ছ, চেঁচামেচি করছ। বন্ধু, আমার ইচ্ছে করে তোমার অবস্থায় আমি যদি থাকতাম! আমার দিকে একটু তাকিয়ে দেখ। আমার একটা মাত্র হাত আছে, মুখের একটা অংশ উড়ে গেছে, তবুও আমি কোনো অনুযোগ জানাচ্ছি

না। এই রকম চেঁচামেচি আর অনুযোগ যদি বন্ধ না করো তাহলে জেনে রেখো শুধু তোমার ব্যবসাটাই হারাবে না, হারাতে হবে তোমার স্বাস্থ্য, সংসার আর বন্ধু-বান্ধবকেও!

'ওই মন্তব্যগুলো আমাকে স্তব্ধ, হতবাক করে দিল। আমি বুঝতে পারলাম আমি কত সুখে আছি। আমি তখন সেই মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা করলাম আমি আবার আগের মতোই হব–আর হলামও তাই।'

আমার এক বান্ধবী লুসিল ব্লেক, এক শোচনীয় অবস্থায় পড়তে পড়তেও বেঁচে গিয়েছিল। তার দুশ্চিন্তাই কেবল ছিল–তার কি নেই, কিন্তু তার কি আছে একবারও চিন্তা করে সে দেখে নি।

লুসিলের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে বেশ কয়েক বছর আগে আমরা যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটগল্প লেখার পাঠ নিচ্ছিলাম। নয়বছর আগে সে জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ধাক্কা খায়। সে থাকত আরিজোনার টাকশনে। তার কাহিনী তার জবানীতেই শুনুন :

'আমি একদম ঘূর্ণির মতো জীবন কাটাচ্ছিলাম। আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অর্গান বাজানো শিখছিলাম, তাছাড়াও শিখছিলাম অনেক কিছু, সংগীতবোধ সম্পর্কে ক্লাসে বক্তৃতাও দিতাম। নানা অনুষ্ঠানে, নাচে, ঘোড়ায় চড়ায় অংশও নিতাম। একদিন সকালে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আমার বুকের অসুখ দেখা দিল। ডাক্তার জানালেন, আপনাকে এক বছর বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে, সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তিনি

একবারও উৎসাহ জানিয়ে বললেন না আবার আগেও মতো আমি সুস্থ্য হয়ে উঠতে পারব।

'বিছানায় শুয়ে এক বছর কাটাতে হবে? শয্যাশায়ী হয়ে–শেষপর্যন্ত হয়তো মারাই যাব। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এরকম হল কেন? আমি কি অপরাধ করলাম যে এমন শাস্তি আমাকে পেতে হবে? আমি বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লাম। এছাড়াও আমি যেন তিক্ত আর বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। তা সত্ত্বেও ডাক্তারের পরামর্শ শুনে শয্যাতেই আশ্রয় নিলাম। আমার প্রতিবেশী শিল্পী মি. রুডল আমাকে বললেন, তুমি ভাবছ বিছানায় এক বছর শুয়ে থাকা ভারি কষ্টকর। কিন্তু দেখে নিও, তাহলে তুমি ভাববার অনেক সময় পাবে আর নিজেকে জানতে পারবে। তোমার সমস্ত আগেকার জীবনটায় যা পার নি আগামী কয়েক মাসে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে দারুণভাবে।' এসব শুনে আমি কিছুটা শান্ত হলাম আর নতুন কিছু মূল্যবোধ একজন বেতার ঘোষককে বলতে শুনলাম : আপনার জ্ঞানে যা আছে সেটাই আপনি প্রকাশ করতে পারেন। এ ধরনের কথা আগে বহুবার শুনেছি, কিন্তু এখন কথাগুলো আমার শরীরে এবং মনের গভীরে শিরায় শিরায় যেন ছড়িয়ে গেল। আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে, যে চিন্তা নিয়ে আমি বাঁচতে চেয়েছি তাই শুধু ভেবে চলব–সে চিন্তা হল আনন্দ, সুখ, আর স্বাস্থ্য। রোজ সকালে ঘুম ভাঙার পরেই যেসব জিনিসের জন্য আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাই শুধু ভাবতে শুরু করলাম। কোনো যন্ত্রণা নেই। সুন্দর কিশোরী একটি মেয়ে। আমার দৃষ্টিশক্তি। আমার শ্রবণশক্তি। রেডিওতে চমৎকার গান। পড়ার সময়। ভালো খাদ্য, ভালো বন্ধু। আমি এমনই হাসিখুশি উচ্ছল হয়ে উঠলাম যে প্রচুর বন্ধু-বান্ধবী দেখা করার জন্য আসতে শুরু করলে ডাক্তারকে বাধ্য হয়ে একটা নোটিশ

টাঙিয়ে দিতে হল আমার কেবিনে একবারে মাত্র একজন দর্শনার্থীই আসতে পারবেন– তাও আবার নির্দিষ্ট সময়ে।

'এ ঘটনার পর নয়বছর কেটে গেছে আর আমি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চমৎকার জীবন কাটিয়ে চলেছি। একটা বছর যে আমাকে বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে তার জন্যে আমি আজ কৃতজ্ঞ। আরিজোনায় কাটানো ওই একটা বছর আমার কাছে দারুণ মূল্যবান আর সুখের বছর। ওইসময় যে আশীর্বাদ আমি পেয়েছি তা প্রতি সকালে স্মরণ করার অভ্যাসটি আজও আমার রয়ে গেছে। এটা আমার কাছে অত্যন্ত দামি কোনো সম্পদ। এটা বুঝতে আমি লজ্জাবোধ করি যে যতক্ষণ না আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি জানতেও পেরেছি, ততদিন সত্যি বাঁচার কথা আমি অনুভব করতে পারি নি।

প্রিয় লুসিল ব্লেক তুমি হয়তো উপলব্ধি করতে পার নি, তবে তুমি যা শিখেছিলে সেই শিক্ষাই লাভ করেছিলেন দুশ বছর আগে ড. স্যামুয়েল জনসন। ড. জনসন বলেছিলেন : প্রতি ঘটনার ভালো দিকটা দেখা বছরে হাজার পাউন্ডের চেয়েও বেশি মূল্যবান।

এই কথাগুলো মনে রাখবেন, কোনো পেশাদার আশাবাদীর মুখ থেকে বের হয় নি, বরং বেরিয়েছিল এমন একজন মানুষের মুখ থেকে যিনি বিশ বছর যাবত উদ্বেগ, দারিদ্র আর অনাহারের মুখোমুখি হন-আর শেষপর্যন্ত তিনি সেই আমলের এক বিখ্যাত লেখক এবং সর্বকালের নামী বক্তা হয়ে ওঠেন। লোগান পিয়ারসন স্মিথ অল্প কথার মধ্যে একমুঠো দামি কথা প্রকাশ করেছিলেন এভাবে : 'জীবনে দুটো বস্তুর জন্য নজর রাখা উচিত, আপনি যা চান তাই পাওয়া, আর তারপর সেটা উপভোগ করা। একমাত্র সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষই দ্বিতীয়টি লাভ করে থাকে।

আপনার কি জানতে ইচ্ছে আছে রান্নাঘরে শুধু ডিস দেওয়াও কত উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়? তা যদি থাকে তাহলে বর্গহিল্ড ডালের লেখা একখানা বই পড়ে দেখতে পারেন। বইখানার নাম 'আমি দেখতে চেয়েছিলাম।

এ বইখানা লিখেছিলেন যে মহিলাটি তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অন্ধই ছিলেন। ভদ্রমহিলা লিখেছেন : আমার মাত্র একটা চোখ ছিল আর সে চোখও এমন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যে সামান্য একটা ফুটো দিয়ে আমাকে দেখতে হত। একেবারে চোখের কাছে এনে প্রায় চোখে লাগিয়েই কোনো বই দেখতে পেতাম তারপর লেখা চোখে পড়ত চোখ টান টান করে একেবারে বাঁ পাশে তাকালে।

এমন হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারো অনুকম্পা নিতে চান নি, চান নি অন্যরকম কোনো ব্যবহার। ছোটবেলায় অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে তিনি এক্কাদোক্কা খেলতে চাইতেন, কিন্তু মাটিতে দেয়া দাগ তিনি দেখতে পেতেন না। তাই সব বাচ্চারা খেলার পর বাড়ি চলে গেলে তিনি মাটিতে চোখ লাগিয়ে দাগগুলো দেখার জন্য হামাগুড়ি দিতেন। এমনি করে মাটির প্রতিটি দাগই তিনি একেবারে মনে গেঁথে রেখেছিলেন। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে তিনি সকলকে প্রায় হারিয়ে দিতেন। বাড়িতেই তিনি লেখাপড়া করতেন, বড় বড় অক্ষরে লেখা বই ডিগ্রী লাভও করেছিলেন। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি আর কলম্বিয়া থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

তিনি মিনেসোটারা টুইন ভ্যালিতে ছোট্ট এক গ্রামে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন আর শেষপর্যন্ত তিনি সাউথ ডাকোটার অগাস্টানা কলেজের সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের

অধ্যাপিকা হন। সেখানে তিনি তেরো বছর শিক্ষাদান করেন আর মেয়েদের ক্লাবে বক্তৃতা দেন। তিনি রেডিওতে বই আর লেখকদের উপর কথিকাও প্রচার করেন। তিনি লিখেছেন : আমার মনের কোণে বরাবরই চিরদিনের মতো অন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তিরতির করে কাঁপত। এটা তো বাঁচার জন্যই জীবন সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ আনন্দ-উচ্ছল, হাস্যময় একটা ধারণা পোষণ করতাম।

এরপর ১৯৪৩ সালে তাঁর বয়স যখন বায়ান্ন বছর, একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যায়। বিখ্যাত মেয়ো ক্লিনিকে তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। এর ফলে তিনি আগের চেয়ে চল্লিশ গুণ বেশিই দেখতে লাগলেন।

এর ফলে তাঁর চোখের সামনে সৌন্দর্যময় উত্তেজনায় ভরপুর একটা দুনিয়ার দরজা খুলে যায়। তিনি রান্নাঘরের বেসিনে ডিস ধোয়ার মধ্যেও অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় স্পর্শ খুঁজে পেলেন। তাঁর নিজের কথায় ব্যাপারটা এই রকম : 'আমি বেসিনের মধ্যে ডিসে লাগানো সাবানের ফেনা নিয়ে খেলতে শুরু করেছিলাম। ওই সাবানের ফেনায় হাত ঢুকিয়ে ছোট ছোট বুদ্বুদের গোল বল তুলে এনে আলোর সামনে ধরে তার মধ্যে দেখে চলতাম ছোট্ট ছোট্ট রংধনু রঙের খেলা।

রান্নাঘরের বেসিনের উপরের জানালা দিয়ে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ত সাদাকালো ডানা ঝাঁপটে তুষার ভ্রুপের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে চড়ুই পাখির ঝাঁক।

চড়ুই পাখি আর সাবান ফেনার ওই অপরূপ দৃশ্য দেখে তাঁর মন ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তিনি তাঁর বইটি শেষ করেন এই কয়টি কথা দিয়ে : 'প্রিয় সৃষ্টিকর্তা, আমাদের

স্বর্গের পিতা, আমি ফিসফিস করে বলি, আমি আপনাকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ দিই, জানাই আমার প্রণাম।

একবার ভাবুন আপনি, যেহেতু ডিস ধুতে পারছেন আর সাবানের বুদবুদে রামধনু দেখতে পাচ্ছেন আর তুষারের বুকে চড়ইকে উড়তে দেখছেন বলে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

আপনার বা আমার নিজেদের সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া উচিত। সমস্ত সময়েই আমরা সৌন্দর্যময় রূপকথার জগতে বিচরণ করে চলেছি। কিন্তু আমরা এমনই অন্ধ যে এসব আমরা দেখেও দেখতে পারি না, আমরা এতই পরিপূর্ণ যে আমরা এই আনন্দ উপভোগ করতে পারি না।

আমরা যদি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে জীবনকে উপভোগ করতে চাই, তাহলে এই নিয়মটাই মেনে চলা উচিত :

‘জীবনে যা পেয়েছেন তারই হিসেব করুন, যা পান নি তার নয়।

৬. অকারণ সমালোচনা ক্ষতি ডেকে আনে

১৯২৯ সালে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যার ফলে শিক্ষাবিদ মহলে বেশ একটা জাতীয় আলোড়ন ঘটে যায়। সারা আমেরিকার শিক্ষিত লোক ব্যাপারটা দেখার জন্যেই ছুটে যান শিকাগোয়। কয়েক বছর আগে রবার্ট হাচিনসন নামে এক তরুণ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়েছিলেন। এই সময় তিনি ওয়েটার, কাঠুরে, শিক্ষক, কাপড়ের ফেরিওয়ালা হিসেবেই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। এরপর এখন মাত্র আট বছর পরে, তাঁকেই আমেরিকার চতুর্থ অর্থশালী বিশ্ববিদ্যায় শিকাগোর প্রেসিডেন্ট পদে বরণ করা হয়েছিল। তাঁর বয়স? মাত্র ত্রিশ। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। অন্যান্য শিক্ষাবিদরা মাথা ঝাঁকাতে চাইলেন। পাহাড় গড়িয়ে পড়া পাথরের স্রোতের মতোই সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলো। সকলে নানা ভাবে তার সমালোচনা করে বলতে লাগলেন 'সে এ-নয়' 'তা-নয়' এসব–তাঁর বয়স বড় কম, অভিজ্ঞতা নেই-শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর ধারণা বাঁকা পথে চলে। এমন কি খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত সকলের সুরে সুর মেলাল।

তাকে যেদিন প্রেসিডেন্ট পদে বরণ করা হয় সেদিনই হাচিনসনের বাবা রবার্ট মেসার্ড হাচিনসনকে তার এক বন্ধু বললেন, আজ সকালে খবরের কাগজের সম্পাদকীয়তে তোমার ছেলে বিরুদ্ধে বিষোদার দেখে আমার অত্যন্ত খারাপ লেগেছে।'

'হ্যাঁ', হাচিনসনের বাবা জবাব দিলেন, 'খুবই কড়া সমালোচনা, তবে মনে রেখো, কেউ মরা কুকুরকে লাথি মারে না।

কথাটা সত্যি। কুকুর যত নামী হয়, ততই আবার লোক তাকে লাথি মেরে মানসিক আনন্দ পায়। প্রিন্স অব ওয়েলস, যিনি পরে অষ্টম এডোয়ার্ড হন (এমন ডিউক অব উইন্ডসর) বেশ ভালো রকম লাথি হজম করার কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তখন ডেভিনশায়ারে ডার্টমুখ কলেজে শিক্ষা নিচ্ছিলেন। এই কলেজ আনাপেলিনের নৌ একাডেমিরই সমতুল্য। প্রিন্সের বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ। একদিন জনৈক নৌ-অফিসার তাঁকে কাঁদতে দেখে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথমে প্রিন্স কথাটা বলতে চান নি, পরে সত্যি কথাটা বলে ফেললেন। তাঁকে নৌ-শিক্ষার্থীরা লাথি মেরেছিল। কলেজের কমোডোর সমস্ত ছেলেদের ডাকলেন। তারপর তাদের তিনি বললেন যে প্রিন্স কোনো অভিযোগ করেন নি, তা সত্ত্বেও তিনি জানতে চান তাঁকে এরকম কড়া ব্যবহারের জন্য বেছে নেয়া হল কেন?

অনেক চেঁচামেচি, হম্বিতম্বি আর মেঝেয় পা ঠোকাঠুকির পর শিক্ষার্থীরা শেষপর্যন্ত স্বীকার করল যে তারা বড় হয়ে যখন রাজার নৌবাহিনীতে কমান্ডার আর ক্যাপ্টেন হবে তখন তাদের এ কথা বলতে পারলে বড় আনন্দ হবে যে তারা একদিন রাজাকে লাথি মেরেছিল।

তাই মনে রাখবেন, আপনাকে কেউ যখন লাথি মারে বা আপনার সমালোচনা করা হয় তখন সেই লোকটির মনে দারুণ শ্রেষ্ঠত্ব বোধ জাগে। এ থেকে প্রায়ই বোঝা যায়-আপনি এমন কিছু ভালো কাজ করতে পেরেছেন তাঁদের নিন্দা করে বেশ বন্য আনন্দ অনুভব করেন। উদাহরণ হিসেবে বলছি, আমি যখন এই পরিচ্ছেদটা লিখছিলাম তখন একজন মহিলার কাছ থেকে স্যালভেশন আর্মির জেনারেল উইলিয়াম বুথের নিন্দা করা একখানা চিঠি পাই। আমি জেনারেল বুথের সম্পর্কে প্রশংসা করে একটা বেতার ভাষণ

দিয়েছিলাম। এই কারণেই মহিলা আমাকে চিঠিটা লেখেন। তিনি ওই চিঠিতে লিখেছিলেন, জেনারেল বুথ গরিব মানুষদের সাহায্যের নাম করে আশি লক্ষ ডলার তুলে সেটা তছরূপ করেছেন। এ অভিযোগ অবশ্য একেবারেই অযৌক্তিক, অসম্ভব। কিন্তু মহিলাটি তো সত্য অন্বেষণ করতে চান নি। এর আসল কারণ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একজন মানুষকে নিন্দা করার মধ্য দিয়ে তিনি ওই বন্য আনন্দ উপভোগ করতে চাইছিলেন। আমি চিঠিটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালাম-ভাগ্যিস ওই মহিলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি। তার চিঠিতে জেনারেল বুথ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতে পারি নি বটে তবে মহিলা সম্পর্কে অনেক কথাই জেনেছি। বহু বছর আগে সোপেন হাওয়ার বলেছিলেন : নোংরা মানুষেরা বিখ্যাত মানুষদের ভুল আর বোকামিতে আনন্দ বোধ করে।

কেউ অবশ্য ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টকে নোংরা মানুষ বলে ভাববেন না, তা সত্ত্বেও ইয়েলের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট টিমোথি ডোয়াইট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন এমন একজনকে আক্রমণ করে অপার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। ইয়েলের সেই প্রেসিডেন্টে বলেছিলেন সবাই সতর্ক করে যে, ওই লোকটা দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে আমাদের বৌ-মেয়েদের আইনের মধ্য দিয়ে বারবণিতায় পরিণত হতে হবে, তারা অপমানিত হবে, খারাপ হয়ে যাবে, সাধুতা আর কমনীয়তা চলে যাবে এবং আল্লাহকে আর মানুষ অসন্তুষ্ট হবেন।

এটা অনেকটা হিটলারকে নিন্দে করার মতোই শোনাচ্ছে, তাই না? কিন্তু তা নয়। এটা ছিল টমাস জেফারসনকে লক্ষ্য করে বলা। কোন্ টমাস জেফারসন? নিশ্চয়ই সেই অমর

টমাস জেফারসন সম্পর্কে নয় যিনি স্বাধীনতার সনদ রচনা করেন এবং যিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারি? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, তিনিই সেই মানুষ।

আপনার ধারণা আছে কোন আমেরিকানকে 'ভণ্ড', 'প্রতারক' আর 'প্রায় খুনের মতো' বলে নিন্দে করা হয়েছিল? খবরের কাগজের এক কার্টুনে তাকে গিলোটিনের তলায় দেখানো হয়–বিরাট এক ছুরির আঘাতে পরক্ষণেই তার গলা দ্বিখণ্ডিত করা হবে। জনসাধারণ তাকে দেখে হিসহিস করেছে, বিদ্রূপ করেছে তিনি যখন রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে যান। তিনি কে ছিলেন? জর্জ ওয়াশিংটন।

তবে এ ব্যাপার ঘটেছিল বহু বছর আগে। কে জানে মানুষের চরিত্র হয়তো তারপর অনেকটাই বদলে গেছে। আসুন, দেখাই যাক। অ্যাডমিরাল পিয়েরির ব্যাপারটাই ধরা যাক–সেই দেশ আবিষ্কারক যিনি ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে চড়ে উত্তর মেরু পৌঁছে দুনিয়ায় তাক লাগিয়ে দেন। যে গৌরব অর্জন করার জন্য পৃথিবীর বহু সাহসী মানুষ অনাহারে থেকে, নানা কষ্ট সহ্য করে ঠাণ্ডায় প্রায় মারা গিয়ে বহু শতাব্দী ধরেই চেষ্টা করেছেন। পিয়েরি নিজেও প্রায় ঠাণ্ডায় মারা যেতেই বসেছিলেন। তার পায়ের আটটা আঙুল ঠাণ্ডায় এমনভাবে জমে গিয়েছিল যে সেগুলো পরে কেটে ফেলতে হয়। দারুণ দুর্বিপাকে পড়ে তার এমন অবস্থা হয় যে তিনি ভেবেছিলেন হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। তার উপরের নৌ অফিসারেরা ওয়াশিংটনে বসে ঈর্ষায় জ্বলছিলেন, কারণ লোকেরা পিয়েরিকে এত প্রশংসা আর প্রচার করছিল। তারপর সেই লোকেরা তাঁর নামে দোষারোপ করতে শুরু করল তিনি নাকি বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য টাকা আদায় করে সেই টাকায় মেরু প্রদেশে স্মৃতি করে কাটাচ্ছেন। এমন ধরনের কথা হয়তো তারা বিশ্বাসও করতে শুরু করেছিল, কারণ আপনি যা

বিশ্বাস করতে চান সেটা বিশ্বাস না করা প্রায় অসম্ভব কাজ। পিয়েরিতে হেয় প্রতিপন্ন করতে আর তাঁকে দাবিয়ে রাখতে চক্রান্তটা এমনই ভয়ানক হয়ে ওঠে যে, শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ম্যাকিনলের এক সরাসরি আদেশের বলেই পিয়েরিকে মেরু অঞ্চলে তার কাজ চালিয়ে যেতে সুযোগ দেয়।

পিয়েরির পিছনে এমন করে কেউ লাগত, তিনি যদি নৌ-বিভাগের একজন কর্মচারী হয়ে নিউইয়র্কের অফিসে ডেস্কে বসে কাজ করতেন? না। যেহেতু তিনি এমন কোন নামী মানুষ হতেন না যে, তাকে দেখে লোকে ঈর্ষাপরায়ণ হবে।

অ্যাডমিরাল পিয়েরির চেয়ে জেনারেল এ্যান্টের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ। ১৮৬২ সালে জেনারেল গ্র্যান্ট উত্তরাঞ্চলের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকরী যুদ্ধে জয়লাভ করেন–যে জয় একটা অপরাহ্নেই সংঘটিত হয়–যে জয় রাতারাতি জেনারেল গ্র্যান্টকে জাতীয় বীরের আসনে বসিয়ে দেয়–যে ঘণ্টা–ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুরণন তুলে, আর মেইন নদীর তীর থেকে মিসিসিপির তীর বরাবর আগুন জ্বালিয়ে প্রায় উৎসব পালন করা হতে থাকে। তার সত্ত্বেও মাত্র এই বিরাট জয়লাভ করার ছ' সপ্তাহ পরে-গ্র্যান্ট, যিনি উত্তরাঞ্চলের বীর–তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার সেনাবাহিনীকে তার হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়। তিনি অপমান আর হতাশায় আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন।

জেনারেল উই. এস. গ্র্যান্টকে তার বিজয় গর্বের মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হল কেন? বেশিরভাগ কারণ হল–তিনি তাঁর অহঙ্কারী উপরওয়ালাদের ঈর্ষার শিকার হন বলেই।

আমরা যদি অন্যায় সমালোচনা ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার ফাঁদে পা রাখতে যাই তাহলে নিচের কার্যকর নিয়মটা মেনে চলা উচিত :

মনে রাখবেন, অন্যায় সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই আড়াল করা প্রশংসাই। আরো মনে রাখবেন, মরা কুকুরকে কেউ লাথি মারে না।

৭. সমালোচনা প্রতিরোধের উপায়

আমি একবার মেজর জেনারেল স্মেডলি বাটলারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। নানা বিশেষণেই তিনি ভূষিত হন। তাঁর কথা শুনেছেন তো? তিনি ছিলেন আমেরিকার নৌবাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে খ্যাতনামা আর আঁকজমকপূর্ণ সেনাপতি।

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর যখন বয়স কম ছিল খুব জনপ্রিয় হবার দারুণ চেষ্টা করতেন আর প্রত্যেকের উপর প্রভাব বিস্তারের আগ্রহ পোষণ করতেন। তখনকার দিনে সামান্য সমালোচনাও আঘাত লাগত আর হুল ফোঁটাতে চাইত। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, নৌবাহিনীতে ত্রিশ বছর কাটানোর ফলে তার চামড়া বেশ পুরু হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন, আমাকে অপমান করে, নিন্দা করা হয়েছিল আর হলদে কুকুর, সাপ এবং এবং অন্যান্য জানোয়ারের সঙ্গে তুলনাও করা হয়। বিশেষজ্ঞরা আমাকে নিন্দা করেন। ইংরেজি ভাষায় যত রকম ছাপার অযোগ্য খারাপ কথা আছে সবই আমাকে বলা হয়। এতে আমি ভাবনায় পড়ি ভাবছেন? ফুঃ! এখন কেউ আমাকে গাল দিতে চাইলেও আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি না কে কথাটা বলেছে।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন বাটলার হয়তো সমালোচনা গ্রাহ্য করতেন না, তবে একটা কথা নিশ্চিত, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই ছোটোখাটো মন্তব্য আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে বড় বেশি রকম বিচলিত বোধ করি। আমার বেশ কয়বছর আগেকার কথাটা মনে পড়ছে যখন নিউইয়র্ক সান পত্রিকার একজন রিপোর্টার আমার বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসে এসে সব দেখে কাগজে ব্যঙ্গ করে জঘন্য সব কথা লেখেন। আমি কি ক্ষেপে গিয়েছিলাম? আমি

ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত অপমান বলেই ভেবেছিলাম। আমি টেলিফোন করে সানের কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান গিল হাজেসকে প্রায় দাবি জানাই তিনি যেন সব ঘটনার বর্ণনা দিয়ে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন–আর মস্করা না করেন। আমি মনে মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করি এই অপরাধের উপযুক্ত শাস্তিদান করবোই।

আজ অবশ্য আমি আমার সেদিনের কাজের জন্য লজ্জাবোধ করি। এখন বুঝতে পারি ওই কাগজ যারা কেনে তারা ওই প্রবন্ধটা হয়তো চোখেই দেখে নি। যারা কাগজ পড়েছে তাদেরও অর্ধেক বোধহয় ব্যাপারটাকে নির্দোষ আমোদ বলেই ভেবেছিলেন। আবার যে অর্ধেক সেটা পড়ে হেসে মজা পান তারাও আবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা ভুলেও যান।

এখন বুঝতে পারি মানুষ আমার বা আপনার সম্বন্ধে ভাবে না বা সেটা গ্রাহ্য করে না। তারা কেবল নিজেদের কথাটাই ভেবে চলে–প্রাতরাশের আগে, প্রাতরাশের, বা মাঝরাতের দশ মিনিট আগে বা ঠিক পরেও। আমার বা আপনার মৃত্যুর খবরের চেয়েও তাদের প্রায় হাজার গুণ বেশি ভাবনা নিজেদের সামান্য মাথা ব্যথা নিয়ে।

যদি আপনার বা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা ছড়ানো হয়, ঠাট্টা করা হয়, ঠকানো হয়, অথবা পিঠে ছুরি মারা হয় বা আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে–তাহলেও যেন আমরা আত্মা-ধিক্কারে অস্থির হয়ে না পড়ি। তার বদলে আসুন আমরা মনে মনে যিশু খ্রিস্টের কথাই ভাবি-কারণ তাঁর ভাগ্যে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মধ্যে একজন সামান্য টাকার বিনিময়ে–আজকের টাকার হিসেবে মাত্র ঊনিশ ডলারের ঘুষ নিয়ে তার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করে। তার বারোজন বন্ধুর মধ্যে আর একজন যিশু বিপদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ত্যাগ করে তিনবার বলে দেয় সে যিশুকে চেনে না–কথাটা সে শপথ নিয়ে বলে। ঠিক ছয়জনের মধ্যে একজন। ঠিক এই রকম ঘটে যায় যিশুর জীবনেও। আমি বা আপনি এর চেয়ে আর ভালো আশা করি কেমন করে?

বেশ কয়েক বছর আগেই আমি আবিষ্কার করি যে, মানুষ অন্যায়ভাবে আমাকে সমালোচনা করে বন্ধ করতে পারি না বটে–তবে একটা ব্যাপার অবশ্যই বন্ধ করতে পারি, তা হল অন্যান্য সমালোচনা শুনে দুশ্চিন্তা করা। আমি নিশ্চয়ই ঠিক করতে পারি, অন্যায় এই নিন্দাবাদে আমি চিন্তায় পড়ব কিনা।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করেই বলি। আমি এর মধ্য দিয়ে সবরকম সমালোচনা অগ্রাহ্য করার কথা বলছি না। একেবারেই না। আমি শুধু অন্যায় সমালোচনা অগ্রাহ্য করতে বলছি। আমি একবার এলিনর রুজভেল্টের কাছে জানতে চেয়েছিলাম অন্যায় সমালোচনার তিনি কীভাবে মোকাবিলা করেন। আর আল্লাহই জানেন এমন জিনিস তাঁকে কত সহ্য করতে হত। হোয়াইট হাউসে যত মহিলা বাস করেছেন তার মধ্যে তাঁরই বোধ হয় সবার চেয়ে বেশি বন্ধু আর সাংঘাতিক রকম শত্রু ছিল।

তিনি আমাকে বলেন, অল্পবয়সে তিনি সাংঘাতিক রকমের লাজুক মেয়ে ছিলেন। তাঁর খালি ভয় হত–লোক কি বলবে। সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর এমনই ভয় ছিল যে একদিন তিনি তাঁর চাচিমা, থিয়োডোর রুজভেল্টের বোনের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তিনি যা জানতে চেয়েছিলেন সেটা

এই রকম : 'চাচিমা, আমি যে কাজ করতে যাই খালি ভয় হয় লোকে কি বলবে।'

তাঁর চাচিমা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন : 'লোকে কি বলবে তা নিয়ে মোটেও ভাববে নাম যতক্ষণ তুমি জানো যে তুমি ঠিক পথেই আছ।' এলিনর রুজভেল্ট আমাকে বলেছেন যে ওই পরামর্শই তার পরবর্তী হোয়াইট হাউসের জীবনে একেবারে একটা শক্ত ভিত হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাকে আরো বলেছিলেন, সমালোচনায় কান না দেয়ার একটা পথ হল চীনা মাটির মূর্তি যেমন আলমারীর তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভাবে থাকা। তার পরামর্শ ছিল এই রকম : নিজের মনে যা ঠিক বলে মনে হয় তাই করবে-কারণ তোমার সমালোচনার করা হবেই। কাজ করলেও লোকে তোমার সমালোচনা করবে–আবার না করলেও তাই।

প্রয়াত ম্যাথুসি ব্রাস ছিলেন ওয়াল স্ট্রিটের আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট। আমি তাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম তিনি কোনোদিন সমালোচনায় চিন্তিত হতেন কিনা। তিনি জবাব দেন : 'হ্যাঁ, ছোটবেলায় আমি এ ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলাম। তখন ভাবতাম আমার প্রতিষ্ঠানের সব কর্মচারীই মনে করুক আমি একদম ঠিক মানুষ। তারা না ভাবলেই আমার দুশ্চিন্তা হত। কোনো মানুষ আমার বিরুদ্ধে গেলেই আমি তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তাতে আবার আর একজন ক্ষেপে যেত। এতে বুঝলাম-যতই একজনকে সন্তুষ্ট করতে চাইব ততই অন্যের অসন্তোষ বাড়বে। আমি শেষপর্যন্ত আবিষ্কার করলাম যে, আমি যতই মনের অসন্তোষ দূর করে কাউকে সুখী করার চেষ্টা করলাম, ততই আমি নিশ্চিন্ত হলাম আমি শত্রুসংখ্যা বাড়িয়ে তুলছি। তাই নিজেকেই শেষ অবধি বললাম : 'তুমি যদি সাধারণের মাথার উপর মাথা তুলে থাকার চেষ্টা করো ততই সমালোচনার সামনে পড়তে হবে। অতএব সমালোচনায়

অভ্যস্ত হতে থাকো।' এটা আমাকে দারুণ সাহায্য করেছে। এরপর থেকে যতটা ভালো হওয়া যায়, তাই হতে চেষ্টা করলাম এবং তারপরেই আমি আমার পুরনো ছাতাটা মাথায় মেলে ধরব তাহলে সমালোচনার বৃষ্টিধারায় আর শরীর ভিজবে না।

জেমস টেলর এ ব্যাপারে আর একটু এগিয়ে ছিলেন। তিনি সমালোচনার ধারায় অবগাহন করতেন আর প্রকাশ্যে হেসে সব উড়িয়ে দিতেন। তিনি প্রত্যেক রবিবারের বিকেলে বেতারে নিউইয়র্কের সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার সংগীত-বিরামের উপর নানা রকম কথিকা প্রচার করতেন। এক মহিলা তাঁকে চিঠি লিখে চোর, বিশ্বাসঘাতক, সাপ আরো নানা সম্বোধনে ভূষিত করেন। মি. টেলর তাঁর অব মেন অ্যান্ড মিউজিক' গ্রন্থে বলেছেন : আমার সন্দেহ ভদ্রমহিলা আমার বক্তৃতা পছন্দ করতেন না। মি. টেলর পরের রবিবার বেতার ভাষণের সময় চিঠিটার উল্লেখ করলেন এবং আবার সেই মহিলার কাছ থেকে চিঠি পেলেন 'চোর', 'সাপ', বিশ্বাসঘাতক' বলে। যিনি সমালোচনাকে এমনভাবে নিতে পারেন তাঁকে প্রশংসা না করে সত্যিই পারা যায় না। আমাদের চোখে পড়ে তাঁর প্রশান্তি, অবিচলিত মনোভাব আর তাঁর হাস্যরসবোধ।

চার্লস্ শোয়ার যখন প্রিন্সটনে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতেন তখন তিনি স্বীকার করেছিলেন যে জীবনে তিনি যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেন, সেটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ইস্পাত কারখানার একজন বৃদ্ধ জার্মানের কাছে। এই বৃদ্ধ জার্মানের সাথে তার সহকর্মীদের যুদ্ধের আমলের কিছু কথাবার্তা নিয়ে তর্কাতর্কি বেধে যায়। অন্য কর্মীরা তাঁকে রাগে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এরপর যখন সে আমার কাছে আসে, শোয়ব লিখেছিলেন, তার সারা গায়ে কাদা আর পানি মাখামাখি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

সে কি এমন বলেছে যাতে তাঁকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে ওরা? সে জবাব দিয়েছিল : আমি কেবল হেসেছিলাম।

মি. শোয়াব স্বীকার করেছেন যে তিনিও ওই বৃদ্ধ জার্মানের নীতিই গ্রহণ করেছেন–শুধু হেসে ফেলা।

এই নীতি বিশেষ করেই ভালো, যখন আপনি অন্যায় সমালোচনার শিকার হবেন। যে আপনার কথার জবাব দেয় তার কথার উত্তর আপনি দিতে পারেন, কিন্তু যে কেবল হাসে, তাকে কি জবাব দেবেন?

লিঙ্কন বোধ হয় ভেঙে পড়তেন, গৃহযুদ্ধের সময়কার প্রচণ্ড চাপের সময় তাঁকে যে রকম বিষাক্ত সমালোচনা করা হত তার যদি উত্তর দিতে হত। এটা যে চরম বোকামি তা তিনি শিখেছিলেন। তাঁর সমালোচকদের তিনি কীভাবে মোকাবিলা করতেন তার বর্ণনা, সাহিত্যের দুনিয়ায় একরকম রত্নের মতই হয়ে আছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার যুদ্ধের সময় এটা তাঁর সদর দপ্তরের ডেস্কে সাজিয়ে রাখতেন। উইনস্টন চার্চিল এটা তার চার্টওয়েলের পাঠকক্ষে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখতেন। এটা ছিল এই রকম : 'আমাকে আক্রমণ করে যা লেখা হয় সেগুলো যদি আমি পড়ার চেষ্টা করি, উত্তর দেয়া তো দূরের কথা তাহলে এ জায়গাটা বন্ধ করেই দেয়া উচিত আমার অন্য কাজের জন্য। আমি সবচেয়ে ভালো কাজটি করার কৌশল আয়ত্ত করেছি আর তাই করে চলেছি–সবচেয়ে ভালো কাজ, আর আমি এই ভাবেই শেষপর্যন্ত কাজ করে যাওয়ার আশা রাখি। যদি শেষপর্যন্ত আমি সঠিক বলেই প্রমাণিত হতে পারি তাহলে আমার বিরুদ্ধে যা বলা হবে

তাতে কিছুই যায় আসে না। শেষে যদি আমি ভুল বলে প্রমাণিত হই তাহলে দশজন ফেরেশতার সাক্ষ্যতেও আমি ঠিক প্রমাণিত হলে কিছু তারতম্য হবে না।'

আপনি বা আমি যখন অন্যায় সমালোচনার মুখোমুখি হব তখন এই নীতিটা মনে রাখুন :

'সবচেয়ে ভালো যা করা সম্ভব করুন তারপর আপনার পুরানো ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়ে সমালোচনা বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করুন।

৮. মধু আহরণে ব্যর্থ হলে মৌচাকের দোষ নেই

১৯৩১ সালের ৭ই মে। এই তারিখে নিউইয়র্ক শহরে দেখা গিয়েছিল সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ এক মানুষ শিকারের দৃশ্য। প্রাচীন এ শহরটায় এমন দৃশ্য কেউ আগে দেখে নি। কয়েক সপ্তাহ খোঁজ করার পর 'দু বন্দুকবাজ' ক্রোলিকে কুজা করেছিল পুলিশ। খুনী ক্রোলির ধূমপানে বা মদ্যপানে আসক্তি ছিল না। সে ধরা পড়ল ওয়েস্ট এন্ড অ্যাভিনিউতে তার প্রেমিকার আবাসে।

প্রায় শত দেড়েক পুলিশ আর গোয়েন্দা তার উঁচুতলার গোপন আবাস ঘিরে ফেলেছিল। ছাদের মধ্যে ফুটো করে তারা পুলিশ খুনকারী' ক্রোলিকে কাঁদানে গ্যাস ছড়িয়ে বের করার চেষ্টা করছিল। এরপর পুলিশ আশেপাশের বাড়িতে মেশিনগানও বসাল-এরপরেই প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নিউইয়র্কের বিলাসবহুল আবাসন এলাকা জুড়ে শোনা যেতে লাগাল পিস্তলের শব্দ আর মেশিনগানের আওয়াজ। ক্রোলি মালপত্র বোঝাই একখানা চেয়ারের পিছনে লুকিয়ে এক নাগাড়ে পুলিশের দিকে গুলি চালাচ্ছিল। দশ হাজার উদগ্রীব মানুষ ওই লড়াই দেখে চলল। নিউইয়র্কের রাস্তায় এমন দৃশ্য আগে কখনো চোখে পড়ে নি।

ক্রোলি ধরা পড়ার সবচেয়ে পুলিশ কমিশনার মালরুনি জানান দু-বন্ধুকবাজ লোকটা নিউইয়র্কের ইতিহাসে ধরা পড়া সবচেয়ে সাংঘাতিক অপরাধী। কমিশনার আরো জানান, সে একটা পালক নড়লেও খুন করতে অব্যস্ত। কিন্তু দু-বন্দুকবাজ' ক্রোলির নিজের সম্পর্কে ধারণা কি রকম? আমরা তা জানতে পেরেছি কারণ পুলিশ যখন তার গোপন

আস্তানায় গুলি চালাচ্ছিল সে তখন জনগণকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখছিল। লেখার ফাঁকে তার দেহের নানা আঘাত থেকে ঝরা রক্তের ধারা কাগজের বুকে লালচে আভা ফুটিয়ে তুলেছিল। চিঠিতে ক্রোলি লিখেছিল : আমার কোটের নিচে ঢাকা আছে এক ক্লান্ত অথচ দয়ার্দ্র হৃদয়–সে হৃদয় কারো ক্ষতি করে না।

এর অল্প কিছুক্ষণ আগে ক্রোলি লং আইল্যান্ডে এক গ্রাম্য রাস্তায় হৈ হুল্লোড়ে মত্ত ছিল। আচমকা একজন পুলিশ রাস্তায় রাখা ওর গাড়ির কাছে এসে বলে, আপনার লাইসেন্সটা একবার দেখি।'

কোনো কথা না বলে ক্রোলি বন্দুক বের করে পুলিশটিকে সীসের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। অফিসারটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেই ক্রোলি গাড়ি থেকে নেমে তার রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে আরো একঝাঁক গুলি করল। আর এই খুনীই কি-না বলেছিল; 'আমার কোটের নিচে ঢাকা আছে এক ক্লান্ত অথচ দয়ার্দ্র হৃদয়–সে কারো ক্ষতি করে না।

ক্রোলিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। সে যখন সিংসিং কারাগারের মরণ কুঠিতে হাজির হল তখন হয়তো তার বলা উচিত ছিল : মানুষ খুন করার পুরস্কার হিসেবে এটাই পাচ্ছি। কিন্তু না, সে যা বললো তা হল : 'আত্মরক্ষার বদলে এটাই আমি পেলাম।'

এই কাহিনীর বক্তব্য হল এই : দু-বন্দুকবাজ' ক্রোলি নিজেকে মোটেই দোষ দিতে চায় নি।

অপরাধীদের মধ্যে এটা কি কোনো অবাস্তব আচরণ মনে করেন আপনারা? তা যদি ভাবেন তাহলে এটা একবার শুনুন।

'আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যই ব্যয় করেছি, তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছি, বদলে যা পেয়েছি তা হল নিন্দা, আর তাড়া খাওয়া পলাতক কোনো মানুষের জীবন।

এ হল অল ক্যাপোনের কথা। জেনে রাখতে পারেন, সে ছিল এখনো পর্যন্ত আমেরিকার জনগণের এক নম্বর শত্রু-শিকাগোতে সেই ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ডাকাত দলের নেতা। ক্যাপোনও নিজের দোষ দেখতে পায় নি। সে আসলে নিজেকে জনগণের উপকারী বন্ধু বলেই ভাবত-একজন অপ্রশংসিত আর ভুল ভেবে নেয়া জনসেবক।

ঠিক এই রকমই করেছিল ডাচ সুলজ, নেওয়ার্কে দুর্বৃত্তদলের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার আগে। নিউইয়র্কের অন্যতম একজন জঘন্য ছুঁচো ডাচ সুল খবরের কাগজে এক সাক্ষাৎকারে বলে সে একজন জনদরদী। ও নিজেও তাই বিশ্বাস করত। সিংসিং কারাগারের ওয়ার্ডেন লয়েজের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক পত্রালাপ হয়। তিনি স্বীকার করেন, 'সিংসিংয়ের খুব কম অপরাধীই নিজেদের দোষী বলে ভাবে। তারা আমার আপনার মতোই মানুষ। আর সেই কারণেই তারা যুক্তি খাড়া করে বোঝাতে চায়। ওরা বুঝিয়েও দিতে প্রস্তুত তারা কোনো সিন্দুক কেন ভাঙে বা গুলিই বা চালায় কেন। ওদের বেশিরভাগই নানা রকম যুক্তি খাড়া করে তাদের সমাজবিরোধী কাজকর্মের সাফাই দিতে চায়, সে যুক্তি ভুল বা যুক্তগ্রাহ্য যাই হোক। তাদের বেশ জোরাল শেষ কথা হল তাদের কখনই আটক করা উচিত হয় নি।'

যদি অল ক্যাপোন, 'দু-বন্দুকবাজ' ক্রোলি, ডাচ সুলজ বা জেলখানার ওই সাংঘাতিক লোকগুলো নিজেদের কোনোভাবেই দোষী বলে না ভাবে-তাহলে আমরা যেসব মানুষের সংস্পর্শে আসি তাদের ব্যাপারটা কি রকম?

পরলোকগত জন ওয়ানামেকার একবার স্বীকার করেন : 'ত্রিশ বছর আগে উপলব্ধি করেছিলাম কাউকে তিরস্কার করা বোকামি। আমার নিজের দুর্বলতাগুলো দূর করতে আমায় কম ঝামেলা সহ্য করতে হয় নি কারণ এটা না বুঝে উপায় ছিল না সৃষ্টিকর্তা সকলকে সমান বুদ্ধি দেন নি।

ওয়ানামেকার এ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বেশ আগে ভাগেই; কিন্তু আমার বেলায় তা হয় নি প্রায় শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ হাতড়ে বেড়াবার আগে আমার উপলব্ধি হয় নি যে শতকরা নব্বই জন মানুষই নিজের দোষ দেখেও কখনো আত্ম-সমালোচনা করতে চায় না।

সমালোচনা করা বৃথা, কারণ এতে মানুষ সাবধানী হয়ে পড়ে আর স্বভাবতই সে নিজের কাজ সমর্থন করার পথ খোঁজে। সমালোচনা মারাত্মক জিনিস যেহেতু এটা মানুষের অহমিকাকে আঘাত করে, তার আত্মগর্বে চিড় ধরে আর তার ফলে যে সেটা ঘৃণার চোখে দেখা শুরু করে।

জার্মান সেনাবাহিনীতে কোনো সৈনিককে কোনো ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই কোনো রকম অভিযোগ পেশ করতে বা সমালোচনা করতে দেয়া হয় না। প্রথমে তার ক্রোধ প্রশমিত করে মাথা ঠাণ্ডা করতে বলা হয়। সে যদি সঙ্গে সঙ্গে কোনো অভিযোগ আনে তাহলে

তাকে শাস্তি দেয়া হয়। সৃষ্টিকর্তা জানেন, সাধারণ মানুষের জীবনেও এরকম কিছু লাইন থাকলে ভালো হত–যেমন হতাশাগ্রস্ত বাবা মা, ঘ্যানর ঘ্যানর করা বউ বা ত্রুটি ধরা জনিত আর পরের ছিদ্র খুঁজে ফেরা জঘন্য সব মানুষের জন্য।

ইতিহাসের হাজার হাজার পাতায় এরকম সমালোচনার অসারতার উদাহরণ খুঁজে পেতে পারবেন আপনারা। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, থিয়োডোর রুজভেল্ট আর প্রেসিডেন্ট ট্যাফটের বিখ্যাত সেই ঝগড়া–যে ঝগড়ার ফলে রিপাবলিকান দল প্রায় ভেঙে যায় আর উড্রো উইলসন হোয়াইট হাউসে ঢোকার সুযোগ পেয়ে যান। আর এর ফলে বিশ্বযুদ্ধে তিনি আলোকোজ্জ্বল লেখার সৃষ্টি করে ইতিহাসের ধারাটাই বদলে দেন।

সব ব্যাপার একটু খতিয়ে দেখা যাক। ১৯০৮ সালে থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন হোয়াইট হাউস ত্যাগ করেন তিনি তখন ট্যাফটকে প্রেসিডেন্ট বানালেন। তিনি এরপর আফ্রিকায় সিংহ শিকার করতে চলে যান। ফিরে এসেই তিনি ফেটে পড়লেন। তিনি ট্রাফটকে তার রক্ষণশীলতার জন্য ভসনা করে নিজেই তৃতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নতুন দল গঠন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ঝগড়াটা বেশ ঘোরাল হয়ে উঠল। এর পরেই নির্বাচন এলো, তাতে উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাফট আর তার রিপাবলিকান দলের দারুণ পরাজয় ঘটল-তারা মাত্র দুটো রাজ্য দখল করতে পারলেন–ডারমন্ট আর উটা। প্রাচীন দলটার এমন হার কখনো হয় নি।

থিওডোর রুজভেল্ট ট্রাফটকেই দোষ দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্যাফট কি নিজেকে দোষ দেন? অবশ্যই না। অশ্রুসজল চোখে ট্যাফট বলেন; আমি বুঝতে পারছি না অন্য আর কিছু আমি করতে পারতাম কি না।'

এখন দোষটা কার? রুজভেল্টের না ট্যাফটের? সত্যি কথা বলতে গেলে আমি সেটা জানি না, গ্রাহ্যও করি না। যে কথাটা বোঝাতে চাই তা হল থিয়োডোর রুজভেল্টের ওই সমালোচনাতেও ট্যাফট নিজেকে দোষী বলে ভাবেন নি। বরং এটা সজল চোখে ট্যাফটকে আত্মসমর্পণ করতে আর ভাবতে বাধ্য করেছিল যে তিন আর কিছু করতে পারতেন কি না।

এছাড়া ধরুন, টিপট ডোম তেল কেলেঙ্কারির কথাটাই। ব্যাপারটা মনে আছে? ব্যাপারটা বছরের পর বছর খবরের কাগজে আলোড়ন তুলেছিল। সারাদেশেই এতে প্রায় কাঁপন ধরেছিল। আজকের দিনে যারা জীবিত আছেন তাঁরা জানেন আমেরিকার জনজীবনে এর চেয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড আর কখনো ঘটে নি। সেই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা ছিল এইরকম : হার্ডিংয়ের মন্ত্রিসভার ইন্টিরিয়র সেক্রেটারি অ্যালবার্ট ফলের উপর দায়িত্ব দেয়া হয় এক হিল আর টিপট ডেডামের সংরক্ষিত সরকারি তেল ভাণ্ডার লীজ দিতে–এই তেল ভাণ্ডার নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যই রাখা ছিল। সেক্রেটারি ফল কি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দর ডেকেছিলেন মনে হয়? না। তিনি ওই দারুণ লাভজনক চুক্তির ব্যাপারটা তার বন্ধু এডওয়ার্ড এল ডোহেনিকে দিয়ে দেন। ডোহেনি কি করলেন? তিনি তার বন্ধু সেক্রেটারি ফলকে 'ধার' হিসেবে দিয়েছিলেন প্রায় লাখ খানেক ডলার। তারপর সেক্রেটারি ফল প্রায় স্বৈরতান্ত্রিক পথে যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবহরকে ওই এলাকায় গিয়ে প্রতিযোগীদের 'এক হিল' রিজার্ভে তাদের তৈল স্তূপ ব্যবহার করা নিবৃত্ত করে হটিয়ে দেবার আদেশ দেন। প্রতিযোগীরা বন্দুক আর বেয়োনেটের মুখে হটে গিয়ে বাধ্য হয়েই আদালতের দ্বারস্থ হলেন–আর তার ফলেই টিপট ডোমের দশ কোটে ডলারের কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গেল। এর ফলে যে দুর্গন্ধ বেরিয়ে এলো সেটা এতই পচন ধরা যে

হার্ডিং শাসন ব্যবস্থাটাই ধ্বংস হয়ে গেল। তা ছাড়াও এরই সঙ্গে সারা দেশটা ঘৃণায় শিউরে উঠল, রিপাবলিকান দলও এসে দাঁড়াল ভাঙনের মুখে আর অ্যালবার্ট বি. ফলের জায়গায় হল কারাগারে।

ফলকে সকলেই প্রচণ্ডভাবে দোষারোপ করল-জনজীবনে এ ধরনের কেউ অভিযুক্ত হয় নি। কিন্তু তাতে তিনি কি অনুশোচনা করেন? কখনো না! বেশ কয়েক বছর পরে হার্বার্ট হুভার এক জনসমাবেশে বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট হার্ডিংয়ের মৃত্যুর কারণ ছিল মানসিক বিপর্যয় আর দুর্ভাবনা কারণ এক বন্ধু তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মিসেস ফল যখন কথাটা শুনেছিলেন তিনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সজল চোখে নিজের ভাগ্যকেই ধিক্কার জানিয়ে চিৎকার কার ওঠেন : 'ক্কি! হার্ডিংকে ফল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? কখনো না। আমার স্বামী কোনোদিন কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। এই বাড়িটা সম্পূর্ণ সোনায় মুড়ে দিলেও আমার স্বামী লোভে পড়তেন না। তারই সঙ্গে আসলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আর যূপকাষ্ঠে তাকেই বলি দিতে নিয়ে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে।

এই হল ব্যাপার। মানব চরিত্রের কাজই এই, দোষীরা সবসময়ই নিজেকে ছাড়া সকলকেই দোষারোপ করে চলে। আমরা সকলেই এই রকম। অতএব আপনি বা আমি যখন আজ বা কাল অন্য কাউকে সমালোচনা করার জন্য উৎসাহিত হব তখন আমাদের মনে রাখা দরকার অল ক্যাপোন, 'দু বন্দুকবাজ' ক্রোলি আর অ্যালবার্ট ফলকে। আমাদের অনুভব করতে হবে সমালোচনা অনেকটা ঘরে ফেরা পায়রার মতই। এটা সবসময়েই নিজেদের ঘরে ফিরে আসে। আমাদের আরো উপলব্ধি করতে হবে যে, লোককে আমরা ঠিক পথে আনতে চাইছি বা দোষ দিতে চাইছি সে সম্ভবত আত্মপক্ষ

সমর্থন করতে আর উল্টে আমাদেরই দোষারোপ করবে। তাছাড়াও, হয়তো বা সেই শান্ত ট্যাফটের মতোই বলবে, 'আমি বুঝতে পারছি না অন্য আর কিছু আমি করতে পারতাম কি না।'

১৮৬৫ সালের ১৫ এপ্রিলের এক শনিবারের সকালে আব্রাহাম লিঙ্কন সস্তাদরের এক সরাইখানার হলঘরের এক শয়নঘরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। সে ঘর ফোর্ডের নাট্যশালার ঠিক সামনের রাস্তায়, যে নাট্যশালায় রুথ তাকে গুলি করে। লিঙ্কনের দীর্ঘ দেহ ঝুলে পড়া তার পক্ষে অতি ছোট একখানা শয্যায় আড়াআড়ি ভাবে শায়িত ছিল। বিছানার ঠিক মাথার দিকে টাঙানো ছিল অত্যন্ত সস্তা রোসা বনহিউর বিখ্যাত ছবি 'দি হর্স ফেয়ারের প্রতিলিপি আর ঘরের মধ্যে হলদে আলো ছড়িয়ে চলে ছিল একটা বিষণ্ণ গ্যাসের আলো।

মৃত্যু পথযাত্রী লিঙ্কনের পাশে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারি অব ওয়ার স্ট্যানটন বলেছিলেন, 'ওই যে শায়িত রয়েছেন পৃথিবীর সবার চেয়ে যোগ্য একজন শাসক।'

জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে লিঙ্কনের সাফল্যের রহস্য কি? আমি দশ বছর ধরে আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী পাঠ করেছি আর তারই সঙ্গে তিনি বছর ব্যয় করেছি 'অজানা লিঙ্কন' নামে একখানা বই সংশোধন করে লিখতে। আমার বিশ্বাস কোনো মানুষের পক্ষে যা সম্ভব সেই ভাবেই আমি লিঙ্কনের ব্যক্তিত্ব আর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আর সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে চেষ্টা করেছি; বিশেষ করে আমি জানার চেষ্টা করেছি লিঙ্কনের জনসংযোগের পদ্ধতিকে; তিনি কি সমালোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন? হ্যাঁ, তাই। ইন্ডিয়ানার পিজিয়ন ক্রিক উপত্যকায় তরুণ বয়সে তিনি যে শুধু সমালোচনাই

করতেন তা নয় বরং মানুষকে শ্লেষ করার মধ্যে দিয়ে তিনি চিঠি আর কবিতা লিখতেন। চিঠিপত্রগুলো তিনি আবার গ্রাম্য পথের বুকে ছড়িয়েও দিতেন যাতে সেগুলো অবধারিত ভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়। এইসব চিঠির মধ্যে একটার জন্য প্রচণ্ড আপত্তি ওঠে আর সেটা সারা জীবনই উত্তর জ্বালার সৃষ্টি করেছিল।

এছাড়াও লিঙ্কন ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডে একজন ব্যবহারজীবি হিসেবে কাজ শুরু করার পরেও তিনি তার বিরোধীদের খোলাখুলি ভাবেই আক্রমণ করে খবরের কাগজে চিঠি প্রকাশ করতেন। একাজে একবার তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়িই করে ফেলেন।

১৮৪২ সালের শরৎকালে তিনি জেমস্ শিল্ডস্ নামে এক গর্বিত অথচ কলহপ্রিয় আইরিশ রাজনীতিককে ব্যঙ্গ করেন। লিঙ্কন স্প্রিংফিল্ড জার্নালে এক বেনামা চিঠিতে ওই লোকটিকে ঠাট্টা করে কিছু লেখেন। সারা শহরই তাতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। স্পর্শ কাতর আর গর্বিত শিল্ডস এতে প্রায় ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি খুঁজে বের করেন চিঠির লেখককে, তারপর তাঁর ঘোড়ায় চড়ে লিঙ্কনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। লিঙ্কনকে পেয়েই তিনি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। লিঙ্কন অবশ্য লড়াই করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন–কিন্তু এ ব্যাপার থেকে তার বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না কারণ তাঁকে সম্মান বাঁচাতে হত। তাঁকে অস্ত্র বেছে নিতে সুযোগ দেয়া হল। যেহেতু তাঁর বেশ বড় বড় হাত ছিল তিনি অশ্বারোহীর উপযুক্ত চওড়া তরোয়ালই বেছে নিলেন। তারপ ওয়েস্ট পয়েন্টের একজন স্নাতকের কাছে তরোয়াল খেলা শিখতে শুরু করলেন। লড়াইয়ের দিনে লিঙ্কন আর শিল্ডস মিসিসিপি নদীর তীরে বালুকাবেলায় আমৃত্যু লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রায় দুজনেরই বন্ধুরা এসে লড়াই বন্ধ করার ব্যবস্থা করল।

লিঙ্কনের জীবনে এটাই বলতে গেলে সবচেয়ে জঘন্য এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এটাই তার কাছে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অমূল্য শিক্ষা। তিনি আর কখনই অপমানজনক চিঠি লেখেন নি বা আর কখনো কাউকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেন নি। আর তারপর থেকেই প্রায় কোনোদিন কাউকে তিনি সমালোচনাও করেন নি কোনো কারণে।

গৃহযুদ্ধ চলার দিনগুলোয় লিঙ্কন অটোম্যাকের যুদ্ধে একের পর এক সেনাবাহিনীতে নতুন নতুন সেনাপতি নিয়োগ করেন। সেইসব সেনাপতিদের মধ্যে একের পর এক আসেন ম্যাকেল্লেলান, পোপ বার্নাসাইড হুঁকার। মিড-আর তাদের প্রত্যেকেই লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ হওয়ায় লিঙ্কন হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েন। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ ওইসব অপদার্থ সেনাধ্যক্ষদের ক্রমাগত দোষারোপ করে চললেও লিঙ্কনের কিন্তু কারো প্রতি কোনো বিষোগার ছিল না, বরং ছিল প্রত্যেকের প্রতিই সদাশয়তা। তিনি শান্তভাবেই সব মেনে নিয়েছিলেন। তার অতি প্রিয় উক্তি ছিল, কারো সমালোচনা করো না, তাহলে নিজেও সমালোচিত হবে না।'

মিসেস লিঙ্কন আর অন্যান্যরা যখন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের কড়া সমালোচনা করতে চাইতেন, লিঙ্কন জবাব দেন : 'ওদের সমালোচনা করো না, ওই অবস্থায় পড়লে আমরাও ওই রকমই করতাম।'

তা সত্ত্বেও, কোনো কারণে যদি কাউকে সমালোচনা করতে হত তিনি ছিলেন নিশ্চয় লিঙ্কনই। একটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে :

গেটিসবার্গের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম তিন দিনে। ৪ঠা জুলাই রাতে শত্রু সেনাপতি লি দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করলে সারাদেশে মেঘে ঢাকা পড়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয়। লি যখন পটোম্যাক নদীর কাছে তার পরাজিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাজির হন তিনি সভয়ে দেখতে পান তাঁর সমানে ফুলে ফেঁপে ওঠা ভয়ঙ্কর এক নদী, যেটা পার হওয়া অসম্ভব, আর তার পিছনে তাড়া করে আসছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় বিজয় বাহিনী। ফাঁদে পড়েছিলেন লি, তার পালানোর আর পথ ছিল না। ব্যাপারটা লিঙ্কন বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর হাতে এসেছিল সৃষ্টিকর্তা-প্রেরিত এক সুবর্ণ সুযোগ-লি'র সেনাবাহিনীকে অবরুদ্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার সুযোগ। অতএব দারুণ আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিঙ্কন সেনাপতি মিডকে আদেশ করলেন কোনো সামরিক পরামর্শ সভা না ডেকে সঙ্গে সঙ্গে লিকে আক্রমণ করতে। লিঙ্কন টেলিগ্রাফ করে লিকে আদেশ জানানোর পর বিশেষ এক দূত পাঠিয়েও মিডকে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে বললেন।

কিন্তু জেনারেল মিড কী করলেন? তাকে যা করার আদেশ দেয়ো হয় তিনি ঠিক তার উল্টোটাই করলেন। তিনি লিঙ্কনের হুকুম সরাসরি অগ্রাহ্য করে সামনিক পরামর্শ সভা ডাকলেন। তিনি ইতস্ততঃ আর দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করতে চাইলেন। তিনি লিঙ্কনকে টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে নানা রকম ওজর আপত্তি তুললেন। তিনি সরাসরি লিকে আক্রমণে অস্বীকৃত জানালেন। শেষপর্যন্ত নদীর পানি কমে গেলে আর লি তার সেনা বাহিনীসহ পটোম্যাক নদী পার হয়ে পালাতে সক্ষম হলেন।

ক্ষেপে আগুন হয়ে গেলেন লিঙ্কন। এসবের উদ্দেশ্য কি?' লিঙ্কন চিৎকার করে তাঁর ছেলে রবার্টকে বলে উঠলেন। হা বিধাতা! এসবের মানে কি? ওদের আমরা আমাদের

মুটোতেই পেয়েছিলাম, শুধু হাত বাড়ালেই ওরা আমাদের হত। তা সত্ত্বেও আমার কথায় বা আদেশে আমার সেনাবাহিনী একটুও নড়ল না। এমন অবস্থায় যে-কোনো সেনাপতিই লিকে পরাজিত করতে পারত। ওখানে আমি থাকলে আমি লি-কে নিজেই চাবকাতে পারতাম।

তিক্ত হতাশায় লিঙ্কন ভেঙে পড়ে তৎক্ষণাৎ নিচের চিঠিটি লিখেছিলেন। একটা কথা মনে রাখবেন, তাঁর জীবনের এসময়ে তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল আর তাঁর বাগবিন্যাসেও যথেষ্ট সতর্কতা ছিল; অতএব ১৮৬৩ সালে লিঙ্কনের কাছ থেকে আসা চিঠিটার মধ্যে আসলে ছিল তীব্র তিরস্কার।

'প্রিয় জেনারেল,

আমার বিশ্বাস হয় না আপনি লি-র পলায়নের মধ্যে যে বিরাট ব্যাপার আর দুর্ভাগ্য জড়িয়ে আছে আদৌ সেটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। সে সহজেই আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল, তাই তাঁর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, আমাদের ইদানীং কালের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের সমাপ্তিই ঘটতে পারত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ যুদ্ধ অনির্দিষ্টকাল ধরেই চলবে। আপনি যদি গত সোমবার নিরাপদে লীকে আক্রমণ না করে থাকতে পারেন তাহলে কীভাবে আপনি তাঁকে নদীর দক্ষিণ দিকে মোকাবিলা করবেন–বিশেষ করে সঙ্গে যখন বেশি সৈন্য নিতে পারবেন না? সেই সেনার সংখ্যা তখনকার তুলনায় দুই তৃতীয়াংশও যখন হতে পারে না! আপনার কাছে এ সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য কিছু আশা করাই অন্যায় হবে আর আমি আশাও করি না আপনি বিশেষ কিছু

করতে পারবেন। আপনার সুবর্ণ সুযোগ আপনি হারিয়েছেন আর এজন্য আমি আশাতীত রকম দুঃখ লাভ করেছি।'

মিড যখন এ চিঠি পেলেন তখন সেটা পড়ে তিনি কি করেছিলেন বলে আপনাদের মনে হয়?

মিড চিঠিটা আদৌ দেখেন নি। কারণ লিঙ্কন আদৌ তা তাঁকে দেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর লিঙ্কনের কাগজপত্রের মধ্যে চিঠিটা পাওয়া যায়।

আমার ধারণা হল-যদিও নিছক একটা ধারণা–যে চিঠিটা লেখার পর লিঙ্কন জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে ধরে স্বগতোক্তি করেছিলেন, এক মিনিট অপেক্ষা করা যাক। মনে হয় আমার এতটা তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। আমার পক্ষে হোয়াইট হাউসের শান্ত পরিবেশে বসে মিডকে আক্রমণ করতে হুকুম দেয়া খুবই সহজ। কিন্তু আমি যদি গেটিবার্গে থাকতাম আর মিড গত সপ্তাহে যে রক্তপাত দেখেছে তা দেখতাম, আহত আর মৃতকল্পদের কাতর আর্তনাদ যদি আমার কানে প্রবেশ করত তাহলে হয়তো আক্রমণ করতে আমিও তেমন উৎসাহবোধ করতাম না। আমার যদি মিডের মতো ভীরুতা মাখা মনোবৃত্তি হত তাহলে সে যা করেছে হয়তো আমিও তাই তরতাম। যাই হোক অনুশোচনা করে লাভ নেই। আমি যদি এ চিঠি ওকে পাঠাই তাতে আমি মানসিক শান্তি পাবো বটে কিন্তু পরিবর্তে মিড যেভাবেই হোক আত্মসমর্পণ করতে চাইবে। এটা হলে সে আমাকে দোষারোপ করতে চাইবে। এর ফলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে আর সেনপাতি হিসেবে তার সব যোগ্যতা আর প্রয়োজনও নষ্ট হয়ে যাবে আর খুব সম্ভব এটার জন্য তাকে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগে বাধ্য হতেও হবে।

অতএব, আমি যা আগেই বলেছি, লিঙ্কন চিঠিটা সরিয়ে রেখে দেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন তীব সমালোচনা আর নিন্দা নিঃসন্দেহে ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হয়। থিয়োডোর রুজভেল্ট বলেছিলেন যে, তিনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন কোনো গভীর সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি আরাম কেদারায় শরীর জড়িয়ে হোয়াইট হাউসে তাঁর ডেস্কের পিছনে টাঙানো লিঙ্কনের বিশাল ছবিটির দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতেন : আমার মতো অবস্থায় পড়লে লিঙ্কন কি করতেন? তিনি নিজের সমস্যার সমাধান কী ভাবেই বা করতেন?

কখনো কাউকে কোনো তিরস্কার করার আগে আমাদের উচিত পকেট থেকে একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করে লিঙ্কনের ছবিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা এমন সমস্যার সম্মুখীন হলে লিঙ্কন কি করতেন?

আপনার কি এমন কাউকে জানা আছে যাকে পরিবর্তিত করে তার উন্নতি ঘটিয়ে পরিচালিত করতে চান? চমৎকার! খুব ভালো কথা। আমিও মনে প্রাণে সেটা সমর্থন করি। তবে একাজ আপনার নিজেকে দিয়েই শুরু করছেন না কেন? এটাকে বেশ স্বার্থপরতার দৃষ্টিতেই দেখতে পারেন, এটা বরং অন্য কাউকে বদলে দেয়া চেষ্টার চাইতে অনেক বেশি লাভজনক–কথাটা নিছক সত্যি, আর ঢের কম বিপজ্জনকও বটে।

ব্রাউনিং একবার বলেছিলেন, কোনো মানুষ যখন নিজের মধ্যেই সংগ্রাম শুরু করতে চায় তখন বুঝতে হবে তার কিছুটা মূল্য আছে। কাজটা ঠিক এখনই শুরু করলে আগামী বড়দিনের মধ্যেই হয়তো নিজেকে শুধরেও নেয়া যাবে। হয়তো এর পরেই দীর্ঘ

অবসরের পর নববর্ষের দিনগুলোয় অন্যান্য সব মানুষকে আপনি সমালোচনা করতে পারবেন।

তবে আগেই নিজেকে ঠিক করে নিন।

কনফুশিয়াস বলেছিলেন, আপনার পড়শীর ছাদের অবস্থা দেখে অনুযোগ জানাবেন না যখন আপনার নিজের সদরই অপরচ্ছিন্ন।

আমার বয়স যখন অল্প তখন মানুষকে প্রভাবিত করার বেশ চেষ্টা করতে চাইতাম। সেই সময় আমেরিকান সাহিত্যাকাশে সমহিমায় বিচরণ করতে যিনি, সেই রিচার্ড হার্ডিং ডেভিসকে আমি একটা মূখের মতো চিঠি লিখেছিলাম। আমি লেখকদের সম্বন্ধে এক সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ রচনা করছিলাম আর এই জন্যই ডেভিসকে অনুরোধ জানাই তাঁর কাজের পদ্ধতি আমায় জানাতে। এর কয়েক সপ্তাহ আগে আমি একজনের কাছ থেক একটা চিঠি পাই, তার তলায় লেখা ছিল 'এটা শ্রুতিলিখিত, কিন্তু পঠিত হয় নি। আমার দারুণ ভালো লেগেছিল সেটা। আমার মনে হয়েছিল লেখক নিশ্চয়ই মস্ত একজন কেউ, হয়তো খুবই ব্যস্ত আর নামী। কিন্তু ব্যস্ততা আমার কণামাত্রও ছিল না, তা সত্ত্বেও রিচার্ড ডেভিসের মধ্যে আমার সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মানোর জন্যই আমার চিঠির শেষে লিখে দিই তিলিখিত, কিন্তু পঠিত নয়।'

তিনি সে চিঠির কোনো উত্তর দেন নি। তিনি শুধু আমার চিঠিটার তলায় এই কথা কয়টি লিখে ফেরৎ দেন : ভদ্রতার কণামাত্রও আপনার জানা নেই। কথাটা সত্যি? আমি খুব বোকামি করেছিলাম, তার ওই গালাগাল আমার পাওয়া ছিল। তবে আমি রক্ত মাংসের

মানুষ বলেই সেটা সহ্য করতে পারি নি। আমার বিতৃষ্ণটা এমন স্তরেই পৌঁছে ছিল যে দশ বছর পরে যখন রিচার্ড হার্ডিং ডেভিসের মৃত্যুসংবাদ পাঠ করি তখনো কথাটা আমার মনে ছিল–অবশ্য স্বীকার করতে আমার লজ্জাই হচ্ছে–কথাটা হল, তিনি আমাকে আঘাত দিয়েছিলেন।

ধরুন, আগামীকাল আমার আপনার মধ্যে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি হল–সেটা কিন্তু কয়েক দশক ধরেই জিইয়ে থেকে মৃত্যু পর্যন্তও থাকতে পারে। সামান্য সমালোচনা করে দেখা যাক, আর সেটা যতখানি যুক্তিসঙ্গতই আমরা ভাবি না কেন।

মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা যুক্তিসহ কোনো প্রাণীর সঙ্গে ব্যবহার করছি না। আমরা এমন কোনো প্রাণীর সঙ্গে কারবার করছি যাদের রয়েছে ভাবাবেগ–এই প্রাণীরা টগবগ করছে সংস্কার নিয়ে আর তারা চালিত হয়ে চলে অহঙ্কার আর গব নিয়ে। তাছাড়া সমালোচনা ভয়ঙ্কর একটা স্ফুলিঙ্গ-যে স্ফুলিঙ্গ অহমিকার কেন্দ্রবিন্দুতে বারুদের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে–যে বিস্ফোরণে কখনো কখনো মৃত্যুও ত্বরান্বিত করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জেনারেল লেনার্ড উডকে সমালোচনা করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ফ্রান্সে যেতে দেয়া হয় নি। তার অহমিকায় এর ফলে যে আঘাত লাগে তাতেই বোধ হয় তার জীবন স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।

অত্যন্ত তিক্ত সমালোচনায় ইংরাজি সাহিত্যকে যারা সমৃদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ রত্ন টমাস হার্ডিকে চিরকালের জন্যই উপন্যাস লেকা ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। এই সমালোচনাই আবার ইংরাজ কবি টমাস চ্যাটারটনকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন যৌবনে খুবই ভোলামনের ছিলেন, অথচ তিনিই আবার কালে কালে এমনই কুশলী আর জনগণের সঙ্গে ব্যবহারে এমনই দক্ষ হয়ে ওঠেন যে তাঁকে ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। তাঁর সাফল্যের রহস্যটা কি? ফ্রাঙ্কলিন নিজেই বলেছিলেন : '... আমি কাউকেই নিন্দা করব না...সকলের মধ্যে যেটুকু ভালো সেটাই শুধু বলব।

যে-কোনো মূখের পক্ষেই সমালোচনা, নিন্দা বা অভিযোগ জানানো সহজ কাজ–বেশির ভাগ মূর্খই তাই কের।

কিন্তু অপরকে বুঝতে পারা আর ক্ষমাশীলতা পেতে গেলে দরকার চারিত্রিক দৃঢ়তা আর আত্মসংযম।

কার্লাইন বলেছিলেন, কোনো মহান মানুষের মহত্বের প্রকাশ ঘটে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন তার মধ্য দিয়ে। তাই মানুষকে নিন্দা না করে বরং তাদের বুঝতে চেষ্টা করি আসুন। চেষ্টা করে দেখা যাক তারা যা করে সেটা তারা কেন করে। এটাই সমালোচনার চেয়ে ঢের বেশি লাভজনক আর কিছুটা বিহ্বলতাময়ও আর এর মধ্যে দিয়ে আনে সহানুভূতি, ধৈর্য আর দয়ার্দ্রভাব। 'সবাইকে জানার অর্থই হল সবাইকে ক্ষমা করা।

ড. জনসন দারুণ একটা কথা বলেছিলেন : 'স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও হয়তো মানুষকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

যে কাজ সৃষ্টিকর্তার অসাধ্য সে কাজ আপনি বা আমি কেমন করে করতে পারব? কাজেই, ক্ষমাই হল মানুষকে জয় করার সঠিক পথ।

৯. জনসংযোগের গোপন কথা

এই পৃথিবীতে অন্যকে দিয়ে কাজ করানোর একটাই মাত্র উপায় আছে। কোনোদিন কথাটা সম্পর্কে কখনো ভাবতে চেয়েছেন? হ্যাঁ, পথ বলতে একটাই আপছে আর সেটা হল অন্য সেই লোকটিকে কাজে আগ্রহী করে তোলা।

মনে রাখবেন, এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ নেই।

অবশ্য কোনো মানুষের পাঁজরায় রিভলভার চেপে দরে তার ঘড়িটা আপনাকে দিতে বাধ্য করতে পারেন। কোনো কর্মচারিকে কাজ করতেও বাধ্য করতে পারেন–অবশ্য আপনি পিছন না ফেরা পর্যন্ত–আর সে বাধ্যতা আনতে পারবেন তাকে কর্মচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে। কোনো বাচ্চাকে কাজ করাতে পারেন তাকে চাবুক মারার ভয় দেখিয়ে বা অন্য ভয় দেখিয়ে। কিন্তু এই ধরনের নিষ্ঠুর পদ্ধতির ফলশ্রুতিতে মেলে অবাঞ্ছিত কিছু।

আপনাকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নিতে পারি শুধু আপনি যা চান তাই আপনাকে দিয়ে।

কিন্তু আপনি কি চান?

ভিয়েনার বিখ্যাত ড. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, যিনি বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে খ্যাতনামা একজন মনোবিজ্ঞানী একবার বলেন যে, আপনি বা আমি যা কিছু করি সেটার উৎপত্তি দুটো উদ্দেশ্য থেকে :

এক. যৌন-কেন্দ্রিক বাসনা।

দুই. মহৎ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক প্রফেসর জন ডিউক এটাকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ড. ডিউক বলেন, মানব মনে গভীর ভাবে যে আকাঙ্ক্ষা প্রোথিত থাকে তা হল–বিখ্যাত হওয়ার বাসনা। কথাটা ভালো করে মনে রাখবেন। বিখ্যাত হওয়ার বাসনা এটা খুবই তাৎপর্যময়। এ বিষয়ে এ বাইটিতে আরো অনেকবার একটা মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে।

আপনি কি চান? হয়তো তেমন বেশি কিছু নয়, তবে যেসব অল্প কিছু জিনিস আপনি চান সেগুলো যাতে আপনাকে দিতে অস্বীকার করা না হয় তার অন্য নিশ্চয়ই দাবি জানাবেন আপনি। প্রায় প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই এইগুলি আশা করে–

১. নিরোগ দীর্ঘজীবন, সুস্বাস্থ্য।

২. খাদ্য।

৩. বিশ্রাম, ঘুম।

৪. টাকা পয়সা আর টাকায় কেনা যায় সে রকম জিনিসপত্র।

৫. সুখ।

৬. যৌন আনন্দ ও তৃপ্তি।

৭. সন্তান-সন্ততির সুখ, সমৃদ্ধি।

৮. নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি।

এসবের প্রায় সবগুলোই পাওয়া সম্ভব–শুধু একটি ছাড়া। কিন্তু খাদ্য বা ঘুমের মতো গভীর আকাঙ ক্ষা বা জরুরি জিনিসেরই মতো আরো একটি জিনিস আছে। এটাকেই ফ্রয়েড বলেছিলেন, বড় হওয়ার আকাক্ষা', একেই আবার ডিউকও বলেছেন বিখ্যাত হওয়ার বাসনা।

লিঙ্কন একবার একটা চিঠি শুরু করেন এই ভাবে : প্রত্যেকেই প্রশংসা পছন্দ করে। উলিয়াম জেমস্ বলেছিলেন : মানব চরিত্রের গভীর এক আকাক্ষা হল প্রশংসা পাওয়ার আকুতি। লক্ষ্য করবেন তিনি 'ইচ্ছা' বা 'আশা' বা 'বাসনা' কথাটা ব্যবহার করেন নি। তিনি ব্যবহার করেছেন 'আকুতি' কথাটা।

এখানেই দেখা যাচ্ছে মানুষের অদ্ভুত, নির্ভুল এক ক্ষুধা; আর এখানেই বিরল প্রকৃতির সেই মানুষ যিনি হৃদয়ের এই ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে পারেন তার পক্ষেই সমস্ত মানুষকে তার হাতের মুটোয় রাখা সম্ভব। আর এটাও ধ্রুব সত্য যে লোকটি করব দিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করে সেও এমন মানুষের মৃত্যুতে দুঃখবোধ করে।

মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে অন্যতম প্রধান তফাৎ হল তার বিখ্যাত হওয়ার মনোবাসনা। একটা উদাহরণ দেয়া যাক : আমি যখন মিসৌরীতে খামারে কাজ করতাম আমার বাবা ডুরকজার্সি জাতের চমৎকার শুয়োর আর সাদা-মুখ গরু পালন করতেন। গ্রামের মেলায় আমরা ওইসব শুয়োর আর সাদামুখ গরু প্রদর্শন করতাম। আমরা এতে বহু প্রথম পুরস্কারও পাই। আমার বাবা সাদা সিল্কের কাপড়ে ওইসব নীল ফিতেগুলো ভালো করে এঁটে রাখতেন আর যখন বন্ধুরা বা কোন দর্শক আসতেন বাবা কাপড়ের এক প্রান্ত আর আমি অন্যপ্রান্ত ধরে সকলকে দেখাতাম।

শুয়োরগুলো অবশ্য যে নীল ফিতে তারা জিতত তাই নিয়ে মাথা ঘামাত না। তবে বাবা ঘামাতেন। পুরস্কারগুলো বাবার মনে একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগাতে চাইত।

আমাদের পূর্বপুরুষদের যদি এ ধরনের জ্বলন্ত শ্রেষ্ঠত্ব বোধের আকাঙ্ক্ষা বা বোধ না থাকত তাহলে সভ্যতা গড়ে ওঠাই অসম্ভব হত। এটা না থাকলে আমরাও হতাম ওইসব জন্ত জানোয়ারের মতো।

এই রকম শ্রেষ্ঠত্ব বোধের তাগিদেই এক অশিক্ষিত, দারিদ্র-পীড়িত মুদির দোকানের কেরানি কোনো বাড়ির বাড়তি পড়তি কিছু পিপের মধ্যে পাওয়া কিছু আইনের বই পড়তে শুরু করেছিলেন। বইগুলো তিনি কিনেছিলেন মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট খরচ করে। আপনারা হয়তো এই কেরানির কথা শুনে থাকবেন, কারণ তিনি আর কেউ নন, লিঙ্কন।

এই রকম শ্রেষ্ঠত্ব বোধের অনুভূতিই ডিকেন্সকে তার অমর উপন্যাসগুলো লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল। এই আকাঙ্ক্ষাই স্যার ক্রিস্টোফার রেন্নকে পাথরের মধ্য দিয়ে সুর সৃষ্টির

প্রেরণা জোগায়। এই আকাক্ষাই আবার রকফেলারকে লক্ষ লক্ষ টাকা করার সাহায্য করে কিন্তু তিনি তা খরচ করেন নি! আর এই আকাঙ ক্ষাই আপনার শহরের সবচেয়ে ধনী মানুষটিকে বিশাল এক প্রাসাদ বানাতেও উদ্বুদ্ধ করেছে, যে বাড়ি তার প্রয়োজনের তুলনায় ঢের বড়।

এই আকাঙ্ক্ষাই আপনাকে সর্বাধুনিক পোশাক পরতে আগ্রহী করে তোলে, আগ্রহী করে একেবারে আধুনিক গাড়ি চালাতে আর আপনার চমৎকার ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে বলতে আগ্রহী করে।

আবার এই আকাঙ্ক্ষাই বহু ছেলেকে ডাকাত আর বন্দুকবাজ হওয়ার জন্য টেনে নিতে চায়। নিউ ইয়র্কের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ই. পি. মালরুনি বলেন : 'আজকের দিনের বেশিরভাগ তরুণ অপরাধীই বিশেষ অহমিকা বোধে আচ্ছন্ন, আর গ্রেপ্তার করার পর তাদের প্রধান অনুরোধ হয় জঘন্য সমস্ত সংবাদপত্রে তাদের বীরের আসনে বসিয়ে সব প্রকাশ করা। তাদের যে বৈদ্যুতিক চেয়ারে ভয়ঙ্কর মৃত্যু বরণ করতে হবে সে কথা আর তাদের মনে থাকে না, তারা শুধু কল্পনা করে নেয় তাদের ছবি ছাপা হবে বেবরূথ, গার্ডিয়া আইনস্টাইন, লিন্ডেনবার্গ, টসকানি নি বা রুজভেল্টের সঙ্গে। আপনি যদি বলেন কেমন করে শ্রেণীত্ব বোধ অনুভব করেন তাহলে আমিই বলে দিতে পারি আপনি কি ধরনের মানুষ। এটাই আপনার চরিত্র কেমন সেটাই জানিয়ে দেবে। এটাই আপনার সম্পর্কে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন ধরুন, জন ডি, রকফেলার তার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি পেয়েছিলেন চীনের পিকিংয়ে একটা আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করার জন্য টাকা দিয়ে। এ হাসপাতাল ছিল লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষের জন্য। যাদের তিনি জীবনে দেখেন নি বা দেখার সম্ভাবনাও ছিল না। অন্যদিকে ডিলিঞ্জার তার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি পায় একজন

ডাকাত, ব্যাংক ডাকাত আর খুনী হয়ে। পুলিশ যখন তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে মিনেসোটার একটা খামার বাড়িতে ঢুকে বলে, আমি ডিলিঞ্জার। সে যে জনগণের এক নম্বর শত্রু সেটা ভেবে সে গর্ব অনুভব করত। সে আরো বলে, আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না, তবে আমি ডিলিঞ্জার।

একটা বিশেষ ব্যাপার হল, ডিলিঞ্জার আর রকফেলারের মধ্যে প্রভেদ হল তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি কীভাবে পেল।

ইতিহাসের পাতায় বিখ্যাত সব মানুষদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য নানা প্রচেষ্টা মজাদার সব উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কি জর্জ ওয়াশিংটনও চেয়েছিলেন তাঁকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহান প্রেসিডেন্ট বলে ডাকা হোক। আর কলম্বাস চেয়েছিলেন তাকে বলা হোক, মহাসুদ্রের অধীশ্বর আর ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি। ক্যাথারিন দি গ্রেট 'হার ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টি' লেখা না থাকলে কোনো চিঠি খুলতেন না। আবার, মিসেস লিঙ্কন হোয়াইট হাউসে মিসেস গ্রান্টকে তার সামনে সবার জন্য বাঘিনীর মতোই চিৎকার করে বলেছিলেন, আপনার এত দুঃসাহস আমি বসতে না বললেও আমার সামনে বসেছেন!

আমাদের দেশের কোটিপতিরা কুমেরু মহাদেশে অভিযান চালানোর জামা টাকা দিয়েছিলেন এই শর্তে যে তুষার মৌলী পর্বত মেলার নামকরণ তাঁদের নামেই রাখা হবে। ভিক্টর হুগোও চেয়েছিলেন আরো বেশি–তাঁর ইচ্ছা ছিল প্যারী শহরের নাম বদলে তার নামেই রাখা হবে। এমন কি শেক্সপিয়ার, সেই মহা শক্তিশালী লেখকও তাঁর পরিবারের জন্য পদক আর পুরস্কার প্রত্যাশা করতেন।

মানুষ আবার অনেক সময় সমহানুভূতি আর নজর কেড়ে নেয়ার জন্য শয্যাশায়ী হতে চায়, আর এটা করে তারা গুরুত্ব পেতে চায়। উদাহরণ হিসেবে মিসেস ম্যাকিনলের কথাটাই ধরুন। তিনি প্রাধান্য পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর স্বামী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রের জরুরি কাজ অবহেলা করে তার দিকে নজর দিতে বাধ্য করেন। প্রেসিডেন্ট স্ত্রীর শয্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে তাকে দুবাহু বেষ্টনে রেখে গুম পাড়ানোর চেষ্টা করতেন। স্ত্রী তাঁর দাঁত বাঁধানোর সময় আবদার করতেন স্বামী সারাক্ষণ তার পাশে থাকুন। একবার দাঁতের ডাক্তারের কাছে তাঁকে বসিয়ে রেখে প্রেসিডেন্ট জন হে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার স্ত্রী বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন।

মেরি রবার্টস্ রাইনহার্ট আমাকে একবার বলেছিলেন, চমৎকার স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী গুরুত্ব বা প্রাধান্য অর্জনের জন্যই শুধু শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। মিসেস রাইনহার্ট বলেন, একদিন মেয়েটির কিছু উপলব্ধি হয়, খুব সম্ভব ওর বয়স, আর যে সে কোনোদিন বিয়ে করতে পারবে না সেই কথাটা। নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে গিয়ে সে বুঝেছিল তার ভবিষ্যত বলে আর কিছুই নেই। সে তাই শয্যার আশ্রয় নিল। আর দশ বছর তার বৃদ্ধা মা চারতলা থেকে বারবার উপর নিচে যাতায়াত করে ট্রে নিয়ে তার সেবা করে চললেন। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা মা পরিশ্রমের ক্লান্তিতে মারা গেলেন। কটা সপ্তাহ মেয়েটি অসহায়

ভঙ্গিতে পড়ে থাকার পর উঠে পড়তে বাধ্য হল। তারপর পোশাক পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞর ধারণা যে, মানুষ রুঢ় বাস্তব জগতে প্রাধান্যের অনুভূতি লাভে ব্যর্থ হয়েই শেষপর্যন্ত উন্মাদজগতের স্বপ্নিল দুনিয়ায় প্রবেশ করে সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোয় মানসিক রোগের যত রোগী চিকিৎসায় আছে তার সংখ্যা অন্যান্য রোগাক্রান্ত রোগীর তুলনায় ঢের বেশি। আপনি যদি নিউইয়র্ক রাজ্যের অধিকাসী হন আর আপনার বয়স পনেরোর বেশি হয়, তাহলে আপনার পাগল হয়ে সাত বছর কাটানোর সম্ভাবনা হল কুড়িজনের মধ্যে একজন।

এরকম পাগল হওয়ার কারণ কি?

কারো পক্ষেই এরকম ঝটিতি উত্তর দেয়া সম্ভব নয়, তবে আমরা জানি যে কিছু রোগ, যেমন সিফিলিস, মস্তিষ্কের কোষগুলো ভেঙে নষ্ট করে দিলে আর তার পরিণতিতেই আসে উন্মাদ রোগ। বাস্তবে, এই মানসিক রোগের অর্ধেকই ঘটে না ধরনের শারীরিক কারণে, যেমন মস্তিষ্কের ক্ষতি, সুরা, টক্সিন বা আঘাত। কিন্তু বাকি অর্ধেকটা–এটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর-বাকি যারা উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয় তাদের মস্তিষ্কের কোষে আপাত দৃষ্টিতে কোনো গলদ থাকে না। ময়না তদন্তের সময় যখন উচ্চ ক্ষমতার অনুবীক্ষণের সাহায্যে মস্তিষ্কের ঝিল্লি পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা গেছে ওইসব কোষ আমার আপনার মস্তিষ্কের মতোই সজীব আর কর্মক্ষম।

প্রশ্নটা আমি কিছুদিন আগে আমাদের বিখ্যাত এক উন্মাদাগারের প্রধান চিকিৎসককেই করেছিলাম। এই চিকিৎসক ভদ্রলোক উন্মাদ রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে উচ্চতম সম্মান আর অত্যন্ত লোভনীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তিনি খোলাখুলিই আমাকে জানান যে, মানুষ কেন উন্মাদ হয়ে যায় সেটা তিনি আদৌ জানেন না। আসলে নিশ্চিত ভাবে এটা

কেউই জানে না তবে তিনি বলেন যে, বহুলোক যারা পাগল হয়ে যায়, তারা এই পাগলামির মধ্যে একটা প্রাধান্য লাভ করার অনুভূতি খুঁপে পায়, যেটা রূঢ় বাস্তবে তারা পেতে ব্যর্থ হয়। তারপনেই তিনি নিম্নলিখিত কাহিনীটি শোনান :

বর্তমানে আমার হাতে একজন রোগিনী আছেন যারা জীবনে বিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। তিনি চেয়েছিলেন ভালোবাসা, যৌন আনন্দ, সন্তান আর সামাজিক সম্মান। কিন্তু রূঢ় জীবন তা রসব আশাই নষ্ট করে দেয়। তাঁর স্বামী তাকে ভালোবাসতেন না। এমন কি তাঁর সঙ্গে খেতেও তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি স্ত্রীকে উপরে তাঁর ঘরে খাবার দিতে বাধ্য করতেন। মহিলাটির কোনো সন্তান বা সামাজিক সম্মান ছিল না। এর ফলে তিনি পাগল হয়ে গেলেন। এরপর কল্পনায় তিনি তাঁর স্বামীকে ডাইভোর্স করেন। কুমারী জীবনের নামও গ্রহণ করেন। তাঁর এখন বিশ্বাস ইংল্যান্ডের অভিজাত সমাজে তাঁর বিয়ে হয়েছে- আর নিজেকে তাই লেডি স্মিথ বলে ডাকার দাবিও করেন।

সন্তানের ব্যাপারে, তিনি কল্পনায় দেখেন প্রতিরাতেই তিনি এক একটি নতুন সন্তান লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তিনি আমায় বলেন, 'ডাক্তার, গত রাতে আমার একটা বাচ্চা হয়েছে।'

জীবন একবার তাঁর স্বপ্নের তরী বাস্তবের রূঢ় প্রস্তরের বুকে আছড়ে ভেঙে দিয়েছিল কিন্তু রৌদ্রকরোজ্জ্বল, কল্পনাময় বিচিত্র উন্মাদ জগক্টায় সেই ভাবনার তরী পাল তুলে তরতর করেই এগিয়ে চলে।

একে কি বিষাদময় বলবেন? এটা বলতে পারব না। তার চিকিৎসক একবার আমাকে বলেন, আমি যদি কোনোভাবে হাত বাড়িয়ে ওঁর উন্মাদ অবস্থা দূর করে দিতে পারি তাহলেও সেটা করব না। নিজের অবস্থাতেই উনি অনেক সুখী।

দল হিসেবে থাকলে পাগলেরা আপনার বা আমার চেয়ে ঢের সুখী। অনেকেই পাগল হয়ে আনন্দ উপভোগ করে চলে। করবে নাই বা কেন? তারা এইভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করে ফেলে। এমন অবস্থায় থাকার সময় তারা বেশ মেজাজেই আপনাদের লক্ষ লক্ষ ডলারের চেক লিখে দেবে বা আগা খায়ের কাছে একটা পরিচয় পত্রও। তাদের স্বপ্নের জগতটাতে তারা তৈরি করে নেয় যে প্রাধান্য তারা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরিছে সেটাই।

কোনো মানুষরা যে প্রাধান্যের অনুভূতির আকাঙ্ক্ষায় পাগল পর্যন্ত হয়ে যায় একবার ভেবে দেখুন, আমি বা আপনি সেই মানুষদের এই পাগলামির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রকৃত প্রশংসা করে কি অলৌকিক ব্যাপারই না ঘটাতে পারি।

যতদূর জানি ইতিহাসে মাত্র দুজন মানুষই বছরে দশ লক্ষ ডলার মাইনে হিসেবে পেয়েছেন। তাঁরা হলেন, ওয়াল্টার ক্রাইসলার আর চার্লস্ শোয়ব।

অ্যান্ড্রু কার্নেগি শোয়াবকে বছরে দশ লক্ষ ডলার বা দৈনিক তিন হাজার ডলারের চেয়ে বেশি কেন দিয়ে যান? কেন?

কারণ শোয়াব দারুণ প্রতিভাবান? না। তবে কি ইস্পাত তৈরির কাজে তিনি অন্যের চেয়ে বেশি কিছু জানতেন? এও বাজে কথা। চার্লস্ শোয়ব নিজেই আমায় বলেছিলেন,

তাঁর নিচে বহুলোক কাজ করত যারা ইস্পাত তৈরির ব্যাপারে তার চেয়ে অনেক বেশি জানত। তাহলে?

শোয়াব বলেছেন যে, তাকে ওই মাইনে দেয়া হত বিশেষ করে তার মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের অদ্ভুত দক্ষতার জন্যই। আমি জানতে চেয়েছিলাম এটা তিনি কেমন করে করেন। নিম্নে তার নিজের মুখে জানানো সেই রহস্যের বিষয় জানাচ্ছি। এই কথাগুলো চিরকালীন সম্পদের মতোই প্রতিটি বাড়ি, স্কুল, প্রতিটি দোকান বা দেশের কর্মস্থলে ব্রোঞ্জে ঢালাই করে টাঙিয়ে রাখা উচিত। যে কথাগুলো শিশুরা লাতিন ব্যাকরণের ক্রিয়ার গোড়ার কথা শিখতে গিয়ে বা ব্রাজিলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের কথা জানতে গিয়ে সময় নষ্ট করার বদলে মনে গেঁথে রাখবে-যে কথাগুলো শুধু মেনে চলতে পারলে আমার বা আপনার জীবন ধারাও পাল্টে দিতে পারে :

‘আমি মনে করি মানুষের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে তোলার ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে আমার যা কিছু সম্পদ, শোয়াব বলেছিলেন। এটাই আমার সমস্ত ক্ষমতার গোড়ার কথা আর আমি মনে করি কোনো মানুষের মধ্যের সেরা বস্তু আহরণ করার শ্রেষ্ঠ পথ হল তাকে প্রশংসা করা আর উৎসাহ দেয়া।

‘উপরওয়ালার কাছ থেকে সমালোচনার মতো আর কিছুই কোনো মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এমন ভাবে ক্ষতি করে না। আমি কাউকে সমালোচনা করি না। আমি কোনো মানুষকে কাজ করার উৎসাহ দেয়াতেই বিশ্বাসী। আমি তাই প্রশংসা করতেই উদ্বিগ্ন থাকতে অভ্যস্ত, আর দোষ খুঁজে পেতে আমি ঘৃণা করি। আমি যা পছন্দ করি তা হল আমার কাজে আমি আনন্দ লাভ করি আর প্রশংসা আমি দরাজ ভাবেই করি।‘

ঠিক এটাই করেন শোয়াব। কিন্তু গড়পড়তা সাধারণ মানুষ কি করে? ঠিক এর উল্টোটাই। তাদের কোনো কিছু পছন্দ না হলে তারা মরা মানুষকে জাগাতে চায় কিন্তু প্রশংসার কিছু থাকলে তারা মুখ খোলে না।

শোয়ব আরো বলেন, আমার জীবনে বহু মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে সাব পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের সংস্পর্শেই আমি এসেছি। আমি বলতে চাই আমি আজো পর্যন্ত এমন কোনো মানুষ দেখি নি যারা যত নামী দামি মানুষই হোক না কেন প্রশংসা করলে ভালো কাজ করেন নি বা সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হন নি এমন কাউকেই পাই নি।

শোয়ার আরো জানিয়েছিলেন, অ্যান্ড্রু কার্নেগির সেই ঘটনাবহুল সাফল্যের চাবিকাঠিও এই জিনিস। কার্নেগি তার সহকর্মীদের খোলাখুলি আর আড়ালেও প্রশংসা করতেন।

এছাড়াও কার্নেগি তার সহকর্মীদের প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন তাঁর সমাধি প্রস্তরের মধ্য দিয়েও তিনি নিজে একটা সমাধি ফলক লিখেছিলেন, যাতে খোদাই করা ছিল এই কথাগুলা : ‘এখানে এমন একজন শায়িত আছেন যিনি তার চেয়েও বুদ্ধিমান মানুষদের সঙ্গে মিশতে পারতেন।‘

জনসংযোগের কাজে রকফেলারের সাফল্যের অন্যতম রহস্যও ছিল আন্তরিক প্রশংসা করা। যেমন উদাহরণ হিসেবে একবার যখন তাঁর একজন অংশীদার এডওয়ার্ড টি বেডফোর্ড, দক্ষিণ আমরিকায় কিছু লগ্নী করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রায় দক্ষ লক্ষ ডলার ক্ষতি করে বসলেন, জন ডি অবশ্যই দারুণভাবে সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি জানতেন বেডফোর্ড তার যথাসাধ্যই করেছেন–অতএব ব্যাপারটির ওখানেই ইতি

ঘটল। রকফেলার প্রশংসা করার একটা পথ পেয়ে গেলেন, তিনি তাই বেডফোর্ডকে প্রশংসা করে বললেন মোট টাকার শতকরা ষাট ভাগ তো তিনি বাঁচাতে পেরেছেন। 'এ কাজ সত্যিই দারুণ', রকফেলার বলেছিলেন। 'উঁচু তলার মানুষও এমন সচরাচর করতে পারে না।'

জিগফিল্ড ছিলেন ব্রডওয়েকে যাঁরা উদ্ভাসিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন সবসেরা প্রমোদ সংগঠক। তিনি সুনামের অধিকারী হয়ে ওঠেন আমেরিকান মেয়েদের গৌরবান্বিত করে তোলার কাজে সূক্ষ্ম ক্ষমতা অর্জন করে। তিনি কাজ করতেন এইভাবে যাদের দিক কেউ দুবার তাকায় না এমন সাধারণ মেয়েদের তিনি মঞ্চে বারবার নিয়ে এসে ক্রমে তাদের রহস্যময়ী আর লাবণ্যময়ী করে গড়ে তুলতেন। প্রশসা আর আত্মবিশ্বাসের মূল্য তিনি জানতেন বলেই তিনি মেয়েদের তাঁর সাহসিকতা আর বিবেচনাবোধ দিয়ে এই বিশ্বাস জাগাতেন যে তারা সুন্দরী। তিনি আসলে ছিলেন বাস্তববোধের মানুষ, তাই তিনি কোরাস মেয়েদের মাইনে মাসে ত্রিশ ডলালের বদলে প্রায় একশ পঁচাত্তর ডলারে তুলে দেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন খুবই চমকদার মানুষ, অনুষ্ঠান রাত্রির উদ্বোধনের সময় তিনি প্রতিটি অংশগ্রহণকারিণীকে টেলিগ্রামে শুভেচ্ছা জানাতেন আর প্রতিটি কোরাসের মেয়েকে চমৎকার রক্ত গোলাপ উপহার দিতেন।

একবার আমায় অনাহারে থাকার পাগলামিতে পেয়েছিল আর তাই ছয় রাত ছয় দিন না খেয়ে কাটাই। ব্যাপারটা তেমন কঠিন ছিল না। দুদিনের শেষে যতখানি ক্ষুধার্ত ছিলাম তার চেয়ে ছয়দিনের মাথায় কমই ক্ষুধার্ত হই। তা সত্ত্বেও আমি জানি, আর আপনিও জানেন, অনেকেই নিজেদের অপরাধী ভাবতে চাইবে তারা যদি তাদের পরিবারের লোকজন বা কর্মচারিদের ছয় দিন অনাহারে রেখে দেয়। অথচ তারাই আবার তাদের

ছয় দিন কেন, ছয় সপ্তাহ বা ষার্ট বছরেও তাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই আহার্যের মতোই প্রশংসাটুকু করতে চাইবে না। অ্যালফ্রেড লাস্ট যখন রিইউনিয়ন ইন ভিয়েনা'তে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তখন তিনি বলেন, আমি যা সবচেয়ে বেশি চাই তা হল আমার আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার জন্য কিছু প্রশংসা।'

আমরা নানা ভাবেই আমাদের ছেলেমেয়েদের, বন্ধু-বান্ধব বা কর্মচারিদের শরীরের জন্য যত্নের ব্যবস্থা করি কিন্তু কদাচিৎ আমরা তাদের আত্মবিশ্বাসের যত্ন নিতে চাই। আমরা তাদের মাংস আর আলু খাইয়ে শক্তি বাড়াতে সাহায্য করি কিন্তু দুঃখের কথা, তাদের প্রশংসার বাণী শোনাতে আমাদের অবহেলা অফুরন্ত। আমরা বুঝি না এই প্রশংসা তাদের মনে প্রভাত সংগীতের মতোই চিরজাগরুক থাকতে পারে।

কোনো কোনো পাঠক বোধহয় এপর্যন্ত পড়ে বলতে চাইবেন : পুরনো বস্তাবন্দি মাল! একদম বাজে আর তোষামোদ ছাড়া কিছুই না। এ জিনিস আমরা জানি। এতে কাজ হয় না–বিশেষ করে বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে।'

ঠিক কথা, তোষামোদে বুদ্ধিমান মানুষেরা কদাচিত ভোলেন। তোষামোদ হল, স্বার্থপরতামাখা আর। কপটতায় জড়ানো কিছু। এটা সাধারণত : ব্যর্থ হয় আর তা হওয়ারই কথা। এটাও সত্যি কথা যে কিছু কিছু মানুষ প্রশংসা শোনার জন্য এতই লালায়িত আর উদগ্রীব থাকে যে তারা যে কোনো কিছুই গিলতে তৈরি, অনাহারক্লিষ্ট মানুষ যেমন গাস বা কুচোমাছের টোপও গিলে ফেলে।

উদাহরণ হিসেবে বহুবিবাহকারী ডিভানি ভাইদের কথাটাই একবার ধরুন। এই ডিভানি ভাইরা বিয়ের বাজারে একেবারে জ্বলজ্বলে তারার মতোই ছিল। তারা, অর্থাৎ এই তথাকথিত রাজপুত্ররা কেমন করে দুই অপরূপ সুন্দরী আর বিখ্যাত অভিনেত্রী, বিখ্যাত একজন অপেরা গায়িকা আর লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বারবারা হাটনকে বিয়ে করেছিলেন? কেন? আর কেমন করেই বা তারা এটা করে?

'লিবার্টি' নামে একটা কাগজে অ্যাডেলা রোজার্স সেন্ট জন লিখেছিলেন, '...মেয়েদের কাছে ডিভানিদের আকর্ষণের ব্যাপার যুগ যুগ ব্যাপী কোনো রহস্যেরই অঙ্গ।

তিনি আরো জানান, 'বিখ্যাত পোলা নেগ্রি পুরুষ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আর বিখ্যাত শিল্পী একবার ব্যাপারটা আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওরা তোষামোদের ব্যাপারটা এতই ভালো বোঝে যেটা আর কোনো আমার দেখা পুরুষকে কখনই দেখি নি। আর এই তোষামোদ ব্যাপারটা এই রসকষহীন বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আর আপনাকে কথা দিতে পারি যে মেয়েদের কাছে ডিভানি ভাইদের আকর্ষণের রহস্যটাও এটাই।

এমন কি মহারাণী ভিক্টোরিয়াও তোসামোদপ্রিয়া ছিলেন। ডিসরেলি স্বীকার করেছিলেন যে, রাণীর সঙ্গে কাজকর্ম করার সময় তিনি এ কাজটা বেশ চমৎকার ভাবেই করতেন। তার ঠিক নিজের ভাষায় ব্যাপারটা ছিল এই রকম, '...বেশ চমৎকার করে তোোষামোদের প্রলেপ লাগাতাম। এটাও জানা কথা ডিসরেলি ছিলেন বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ, নিখুঁত আর ধূরুন্ধক একজন মানুষ। নিজের জগতে তিনি ছিলেন একজন পাকা লোক। তার পক্ষে যে কাজ করা সহজ ছিল সেটা

আমার বা আপনার পক্ষে কাজের হবে না। তোষামোদ হল অনেকটা জাল টাকার মতো আর জাল টাকার মতোই তা আপনাকে সেটা চালাতে গেলে বিপদে ফেলবে।

তাহলে প্রশংসা আর তোষামোদের মধ্যে তফাৎ কি? খুবই সহজ। একটা হল আন্তরিক আর অন্যটা হল কপটতা মাখানো। একটার উৎপত্তি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আর অন্যটা সম্পূর্ণ বানানো। একটা স্বার্থপরতা মুক্ত আর মন্যটা স্বার্থপরতা জড়ানো। একটিকে সারা পৃথিবীই প্রশংসা করে আর অন্যটাকে সারা পৃথিবী ঘৃণা করে।

আমি কিছু দিন আগে মেক্সিকো সিটির ক্যাপশটেপেক প্রাসাদে জেনারেল ওব্রেগণের একটা আবক্ষ মূর্তি দেখে এসেছি। মূর্তির নিচে জেনারেল ওব্রেগণের জীবন দর্শন থেকে এই কথাগুলো খোদাই করা আছে : ‘যে শত্রু আপনাকে আক্রমণ করছে তাকে ভয় পাবেন না। যে বন্ধুরা আপনাকে তোষামোদ করে তাদের সম্পর্কে সাবধান থাকুন।

না! না! না! আমি তোষামোদের হয়ে ওকালতি করছি না। এর ধারে কাছেও আমি যাচ্ছি না। আমি শুধু এক নতুন জীবন প্রবাহের কথাই বলছি। আমাকে আবার বলতে দিন- ’আমি এক নতুন জীবন প্রবাহের কথাই বলছি।

রাজা পঞ্চম জর্জ বাকিংহাম প্রসাদে তার স্টাডি কক্ষে ছয়টি নীতিবাক্য টাঙিয়ে রেখেছিলেন। একটি নীতি বাক্য হল : ‘সস্তা তোষামোদ করতে বা পেতে যেন শিক্ষা না পাই।এটাই আসল কথা, তোষামোদ হল সস্তা প্রশংসা। একবার তোষামোদের চমৎকার একটা অর্থ শুনেছিলাম। সেটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না : ‘তোষামোদ হল আসলে নিজের সম্পর্কে কীভাবে সেটাই বলে দেয়া।

আমরা যদি সবাই তোষামোদ করতে চাইতাম, তাহলে সবাই সেটা গ্রহণ করে কাজ করত আর আমরাও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে রপ্ত হয়ে উঠতাম। আমরা যখন কোনো বিশেষ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই না, আমরা সাধারণতঃ আমাদের ভাবনার শতকরা ৯৫ ভাগই নিজের সম্বন্ধে ভেবে কাটাই।

এখন কিছুক্ষণের জন্যও যদি নিজেদের সম্বন্ধে আমরা ভাবনা বন্ধ করি আর অন্য সবাইয়ের ভালো ভালো ব্যাপারে ভাবতে শুরু করি তাহলে আমাদের আর ওই সস্তা আর মিথ্যে তোষামোদ রপ্ত করা দরকার হবে না আর সেটা প্রায় মুখ থেকে বের করার আগেই লোক জেনে ফেলবে।

এমার্সন বলেছিলেন : যেসব মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে তারা সবাই কোন না কোন ভাবে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর মধ্য দিয়ে আমি তার সম্পর্কে জানতে পারি।'

এটা যদি এমার্সনের ক্ষেত্রে সত্য হয় তাহলে কি তা আমার বা আপনার ক্ষেত্রে হাজার গুণ বেশি সত্য হয়ে উঠবে না? আসুন, আমাদের কাজকর্ম আর চাহিদা দিয়ে চিন্তা-ভাবনা বন্ধ করি আর চেষ্টা করি অন্য সবাইয়ের সদ্‌গুণ নিয়ে। আর তোষামোদ ব্যাপারটাও ভুলে যান। শুধু আন্তরিক আর ভালো প্রশংসা করতে থাকুন। অন্যকে সমর্থনের বেলায় হাসিমুখে সেটা করুন আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠুন আর তাহলেই দেখবেন মানুষ আপনার কথা মনে রাখবে।

১০. কর্মঠ লোকের পায়ের নিচে পৃথিবী : কর্মহীনকে একাকী নির্জন পথে চলতে হয়

প্রতি বছর গ্রীষ্মকালেই আমি মেইনে মাছ ধরতে যাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি আবার স্ট্রবেরি আর ক্রিম খুবই ভালোবাসি, তবে আশ্চর্য ব্যাপার হল মাছেরা ভালোবাসে পোকামাকড়। অতএব আমি মাছ ধরতে গেলে আমি আমার নিজের পছন্দের কথাটা ভাবি না বরং মাছেরা কি চায় তাই ভাবি। বঁড়শিতে তাই স্ট্রবেরি বা ক্রিম না আটকিয়ে আমি লাগাই পোকামাকড় বা একটা ফড়িং তারপর মাছেদের বলি : কি, এবার আসবে তো তোমরা তোমাদের প্রিয় খাবারের লোভে?”

তাহলে মানুষকে আকর্ষিত করতে গিয়ে এই সাধারণ বুদ্ধিটাই কাজে লাগান না কেন?

লয়েড জর্জও ঠিক এমনটি করেছিলেন। তাঁকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যুদ্ধের সময় উইলসন, অর্ল্যান্ডো আর ক্লিমেন্সের মতো নেতারা যখন বিস্মৃত আর ক্ষমতাচ্যুত হন তখন তিনি কেমন করে এত দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসীন থেকেছেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে থাকার কারণ একটাই, আর তা হল তিনি শিখেছিলেন মাছ বুঝে চার ফেলা চাই।

আমরা যা চাই তা নিয়ে আলোচনা কেন? এটা ছেলেমানুষী অবাস্তব কাজ। এটা অবশ্য ঠিক আপনি যা চান তাতে আপনার আগ্রহ আছে, চিরকাল ধরেই সেটা আছে। কিন্তু

আর কেউ তা নয়। আমরা বাকি সবাই আপনারই মতো, আমরা যা চাই তাতেই আমাদের আগ্রহ।

অতএব এ জগতটায় অন্য মানুষকে আগ্রহী করে তোলার উপায় হল সে যা চায় সে সম্পর্কে কথা বলা আর কি করে সেটা সে পেতে পারে তা দেখিয়ে দেয়া।

ভবিষ্যতে কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে গেলে কথাটা মনে রাখবেন। ধরুন, আপনি চান না আপনার ছেলে ধূমপান করুক, তাহলে তাকে উপদেশ দিতে যাবেন না বা আপনি যা চান বলবেন না। বরং তাকে দেখিয়ে দিন সিগারেট খেলে সে বেসবল টিমে সুযোগ না পেতে পারে বা একশ গজ দৌড়ে বিজয়ী হতেও পারে।

এ ব্যাপারটা মনে রাখা খুবই ভালো, আর তা আপনি ছোট ছেলেমেয়ে, শাবক বা শিম্পাঞ্জি যাকে নিয়েই চলতে চান না কেন। যেমন উদাহরণ হিসেবে : রাফল ওয়ালডো এমার্সন আর তার ছেলে একটা বাছুরকে একদিন কোয়াড়ে ঢোকানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তারা খুব সাধারণ সেই ভুলই করলেন। তারা নিজেরা যা চান তাই করছিলেন। এমার্সন বাছুরটাকে ঠেলে দিচ্ছিলেন আর তাঁর ছেলে টানতে চাইছিলেন। বাছুরটাও নিজে যা চায় তাই করতে লাগল–সে পা শক্ত করে কিছুতেই জায়গাটা ছাড়তে চাইল না। বাড়ির আইরিশ পরিচারিকা ওঁদের ঝামেলা লক্ষ্য করেছিল। পরিচারিকার প্রবন্ধ বা বই লেখার ক্ষমতা ছিল না, তবে এমন অবস্থায় তার প্রচুর সাধারণ বুদ্ধি ছিল, এমার্সনের যা ছিল না। বাছুরের মনোভাব সে বুঝল। সে করলা কি ওর আঙুলটা মাতৃস্নেহে বাছুরের মুখে ঢুকিয়ে দিতেই বাছুরটা সেটা চুষতে শুরু করল আর তাকে ঘরে ঢুকিয়েও দেয়া গেল।

জন্মের পর থেকে আপনি যা করে আসছেন তা হল আপনি কিছু চাইছেন বলে। মনে ভাবুন, যেদিন রেডক্রসের তহবিলে একশ ডলার দান করেছিলেন। হ্যাঁ, এটা নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নয়। আপনি রেডক্রসকে একশ ডলার দিয়েছেন কারণ আপনি সাহায্যের হাত বাড়াতে চেয়েছেন, আপনি চেয়েছেন চমৎকার একটা স্বার্থপরতাহীন স্বর্গীয় কাজ করতে।

একশ ডলারের চেয়ে আপনার মনভাব ওরকম না হলে টাকাটা আপনি হাতছাড়া করতেন না। অবশ্য দানটা আপনি চক্ষুলজ্জাতেও করে থাকতে পারেন বা কোনো মক্কেলের কথাতেও তা পারেন। তবে একটা ব্যাপার ঠিক। আপনি দানটা করেন যেহেতু আপনি কিছু চেয়েছিলেন।

প্রফেসর হ্যারি এ. ওভারস্ট্রিট তার চমৎকার বই 'ইনফ্লুয়েন্সিং হিউম্যান বিহেভিয়ারে,' লিখেছিলেন : 'আমাদের কাজে উৎপত্তি হল আমরা যা চাই তা থেকেই...ভবিষ্যতে যারা অন্যদের বশে আনতে চান, সেটা পরিবারে, স্কুলে, রাজনীতিতে যেখানেই হোক না কেন–তাদের প্রতি সব সেরা পরামর্শ হল প্রথমে সেই মানুষের মনে সে যা চায় সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। একাজ যে করতে পারে সারা দুনিয়াই তার সঙ্গে থাকবে। যে পারে না তাকে একলাই চলতে হয়।'

একেবারে গরিবের সন্তান স্কচ অ্যান্ড্রু কার্নেগি, যিনি ঘণ্টায় দুই সেন্ট রোজগার করে জীবন শুরু করেন আর শেষপর্যন্ত কয়েক হাজার কোটি ডলার দান করেন জীবনের শুরুতেই শিখেছিলেন যে, মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের গোড়ার কথা হল অন্যরা কি

চায় সেটা বুঝে কথা বলা। তিনি মাত্র চার বছর স্কুলে পড়েছিলেন, তবুও মানুষদের ভালোভাবেই চালনা করতে শেখেন।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি : তাঁর শালী একবার তাঁর দুই ছেলে নিয়ে দারুণ চিন্তায় পড়েন। দুজনে ইয়েলে পড়াশুনা করছিল আর তারা নিজেদের নিয়েই এত মশগুল ছিল যে, বাড়িতে চিঠিপত্র লেখার কথা বা মায়ের চিঠির জবাব দেয়াও সময় থাকত না তাদের।

কার্নেগি সব শুনে একশ ডলার বাজি রাখলেন যে, উত্তর না চেয়েও পরের ডাকেই তিনি ওদের উত্তর এনে দেবেন। একজন বাজিতে রাজিও হয়ে গেল। তিনি এবার দু'জনকে বেশ তামাশা করে চিঠি লিখে জানালেন সঙ্গে দু'জনকে পাঁচ ডলার করে নোট পাঠাচ্ছেন।

টাকাটা অবশ্য তিনি পাঠালেন না।

পরের ডাকেই যথারীতি উত্তর এসে গেল মেশোমশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে। অবশ্য চিঠিতে আর কি ছিল নিজেরাই সেটা ভেবে নিন।

আগামীকালই আপনি হয়তো কাউকে দিয়ে কোন কাজ করাতে চাইবেন। কথা বলার আগে একটু চিন্তা করে প্রশ্ন করুন : 'ওকে কাজ করতে আগ্রহী করবো কীভাবে?

এই প্রশ্নটা মনে জাগলে আমরা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে সেই লোককে আমি কি চাই বোঝাতে বসব না। এ কাজ বৃথাই হবে।

নিউইয়র্কের কোনো এক হোটেলের বলরুমটা আমি কুড়িটি রাতের মতো ভাড়া করেছিলাম, উদ্দেশ্য কিছু বক্তৃতা দেয়া। এক সীজুনের শুরুতে আমাকে আচমকা জানানো হল আমার আগের ভাড়ার প্রায় তিনশগুণ বেশি দিতে হবে। এ খবর আমার কাছে আসে টিকিট ছেপে বিলিয়ে দেবার আর ঘোষণা করার পরে।

স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি টাকা দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আমি কি চাই তা নিয়ে হোটেলের সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ হত কি? তাদের আগ্রহ তারা কি চায় তাই নিয়ে। তাই দিন কয়েক পরে আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দেখা করে আমি বললাম, আপনার চিঠিটা পেরে একটু ধাক্কা খেয়েছি। তবে আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আপনার জায়গায় থাকলে আমিও বোধ হয় এরকম চিঠিই লিখতাম। এ হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে যত বেশি লাভ করা যায় সেটা দেখা। তা না করলে আপনার চাকরি হয়তো থাকবে না, আর না থাকাই উচিত। এখন একবার আসুন এক টুকরো কাগজে লেখা থাক এই ভাড়া বাড়ালে আপনার কি সুবিধে অসুবিধে হতে পারে।

এরপর আমি একটা লেটার প্যাডের কাগজ নিয়ে মাঝ বরাবর একটা লাইন টেনে এক পাশে লিখলাম ‘সুবিধা’ অন্যপাশে লিখলাম ‘অসুবিধা।

এবারে সুবিধার ঘরে লিখলাম : বলরুম বিনা ভাড়ায়। তারপরেই বললাম, আপনি বলরুম নাচ আর অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেবার জন্য পেলে আপনাদের সুবিধেই হয়। এবেশ বড় সুবিধে, কারণ এজন্য ভাড়া দিয়ে বক্তৃতার জন্য ঘরটা ছেড়ে দেয়ার চেয়ে

অনেক বেশি লাভ হয়। আপনাদের বলরুমটা কুড়িটা রাতের যত আটকে রাখলে নিশ্চয়ই আপনাদের লাভ বেশ কমই হবে।

‘এবার আসুন অসুবিধের ব্যাপারটা দেখা যাক। প্রথমে, আমার কাছ থেকে বেশি ভাড়া আদায় না করে আপনাকে তা কমাতে হবে। আসলে এটা আপনাকে মন থেকে একদম মুছে ফেলতে হবে। কারণ যে ভাড়া চাইছেন আমি তা দিতে পারব না। আমাকে বাধ্য হয়ে অন্য কোথাও বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হবে।’

‘এছাড়াও আপনার আর একটা অসুবিধে আছে। এই বক্তৃতা আপনার হোটেলে বহুশিক্ষিত আর সংস্কৃতিবান মানুষ টেনে আনবে। আর সেটা আপনার পক্ষে চমৎকার বিজ্ঞাপনই হবে, তাই না? আসলে, খবরের কাগজে আপনারা যদি ৫০০০ ডলারের বিজ্ঞাপনও দেন তাহলেও এত মানুষকে হোটেল দেখাতে হাজির করতে পারতেন না আমি এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যা পারব। এটা হোটেলের পক্ষে অনেকখানি, তাই না?’

কথা বলতে বলতে আমি অসুবিধা দুটো ঠিক জায়গায় লিখে ফেললাম, তারপর কাগজটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বললাম, আশা করি সুবিধে আর অসুবিধে দুটোই ভালো করে দেখে তারপর আপনার মতামত আমায় জানাবেন।

পরের দিনই একটা চিঠি পেলাম, তাতে আমায় জানানো হয়েছিল যে, আমার জন্য ভাড়াটা তিনশগুণের বদলে মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। মনে রাখবেন, এই ভাগই কমানো হয়েছিল এ ব্যাপারে আমার মনের ইচ্ছে একটুও না জানিয়ে। আমি সারাক্ষণই অন্য জন কি চায় আর পেতে পারে সেটাই ভেবেছি।

মনে করুন, স্বাভাবিক মানুষের মতোই আমি যদি কাজ করতাম, ধরুন সটান সবেগে ঘরে ঢুকে আমি বলতাম, এভাবে তিনশগুণ ভাড়া বাড়ানোর মানে কি একবার বলবেন? আপনি জানেন যে টিকিট বিক্রি হয়ে হয়ে গেছে আর ঘোষণাও করা হয়ে গেছে? তিনশগুণ! হাস্যকর? অসম্ভব! এ টাকা কিছুতেই দেব না!

এতে কি হত! একটা তর্কের অবকাশ শুরু হত, বেশ গরম কথাবার্তা চলতো-আর আপনাদের অবশ্যই জানা আছে তর্কের পরিণতি কেমন হয়। তাকে যদি স্বীকার করাতেও পারতাম তার ভুল হচ্ছে, তাহলেও তার অহমিকা বোধই তাকে সব মেনে নিয়েও হার মানাতে দিত না।

মানবিক সম্পর্ক নিয়ে চমৎকার একটা পরামর্শের বিষয়ে বলছি। কথাটা হেনরি ফোর্ডের। তিনি বলেছিলেন, কারো যদি গোপন সাফল্যের চাবিকাঠি থাকে, তাহলে সেটা থাকে তার অন্যের কথার দৃষ্টিকোণ আর নিজের দৃষ্টিকোণ বুঝে নেয়ার মধ্যে।' কথাটা বারবার বলার আর মনে রাখার মতই।

ব্যাপারটা খুবই সরল আর এতই স্বাভাবিক যে, যে কেউ একবার দৃষ্টি মেলেই এর অন্তরের সত্য দেখতে পারবে, তবুও পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই শতকরা ৯০ বার এটা অগ্রাহ্য করে।

কোনো উদাহরণ চান? তাহলে আগামীকাল সকালে যেসব চিঠি আসবে সেগুলো দেখে নিন–তাহলেই দেখবেন বেশিরভাগই এই সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপারটা মানতে চায় না। একটা উদাহরণ নিন কোন বিজ্ঞাপন এজেন্সির বেতার দপ্তরের প্রধানের লেখা

সারাদেশের নানা অফিসের কাছে লেখা। সারা দেশের স্থানীয় বেতার স্টেশনের ম্যানেজারদের কাছে লেখা হয় চিঠিটা (প্রতিটি প্যারাগ্রাফেই আমার প্রতিক্রিয়ার কথা আমি লিখে দিয়েছি)।

মি. জন ব্ল্যাঙ্ক,
ব্ল্যাঙ্ক ভিল, ইন্ডিয়ানা।
প্রিয় মি. ব্ল্যাঙ্ক, আমাদের কোম্পানি রেডিওর জগতে আর বিজ্ঞাপন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চায়।

(আপনার কোম্পানি কি চায় তাতে কার মাথা ব্যথা? আমি আমার সমস্যা নিয়েই বিব্রত। ব্যাংক আমার বাড়ির বন্ধক আগেই বন্ধ করে দিচ্ছি। পোকায় সব ফসল নষ্ট করছে, শেয়ার বাজার গতকাল উল্টেছে, আজ সকালে ৮-১৫র গাড়ি ধরতে পারি নি, জোন্সের নাচের অনুষ্ঠানে গতরাতে আমি নিমন্ত্রিত হই নি, ডাক্তার বলছেন, আমার ব্লাড প্রেসার খুব বেড়ে গেছে, স্নায়ুর রোগ আর খুশকিও হয়েছে। এরপর কি হবে? আমি দুশ্চিন্তা নিয়ে সকালবেলা অফিসে আসব, চিঠিপত্র খুলব, আর খুলেই দেখব নিউইয়র্কের কোনো এক কেউকেটা তার কোম্পানি কি চায় তাই নিয়ে সাতকাহন লিখেছে। ফুঃ। লোকটার যদি ধারণা থাকত এরকম চিঠি কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহলে বিজ্ঞাপন ব্যবসা ছেড়ে যে ঘোড়ার ঘাস কাটা শুরু করত)।

‘এই এজেন্সি জাতীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে টাকা আয় হয় সেটা সবার চেয়ে বেশি। আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী বছরের পর বছর ধরে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে চলেছে।

(আপনারা অনেক বড় আর ধনী, একেবারে চুড়োতেই আপনাদের আসন। তাতে কি? আপনারা জেনারেল মোটর, জেনারেল ইলেকট্রিক আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে নিয়ে গড়া বিরাট কিছু হলেও আমি তার কানাকড়ি দামও দিই না। আপনার যদি ক্ষুদে চড়ুই পাখির মতোও বুদ্ধি থাকত তাহলে বুঝতে পারতেন আমি কত বড় তাতেই আমার আগ্রহ আছে–আপনি কত বড় তাতে নয়। আপনাদের বিরাট সাফল্যর কথা শুনে আমার নিজেকে দারুণ ছোট আর হীন মনে হয়)।

'আমরা চাই আমাদের প্রতিষ্ঠান বেতার সম্পর্কে শেষ কথাই হয়ে উঠুক...।

(আপনারা চান! আপনারা গর্দভ। আপনারা বা মুসোলিনী বা বিং ক্রসবি কি চান আমার জানতে কণামাত্রও আগ্রহ নেই। আপনাকে জানাতে চাই শেষবারের মতো যে আমি নিজে কি চাই তাতেই শুধু আমার আগ্রহ আছে–আর আপনার এই অদ্ভুত চিঠিতে সে কথা আপনি একবারও বলেন নি)।

অতএব আপনার আমাদের প্রতিষ্ঠানকে আপনাদের তালিকায় সাপ্তাহিক বেতার স্টেশনের খবরের জন্য নথীভুক্ত করবেন আশা রাখি...।

(নথীভুক্ত করব! আপনার স্নায়ুর জোর আছে বটে! আপনার বড় বড় কথায় আমার নিজেকে একেবারে অপদার্থ মনে হচ্ছে তার উপর আপনি আবার আমাদের তালিকায় আপনাকে নথীভুক্ত করতে বলেছেন। লেখার সময় একবার 'দয়া করে কথাটা বলারও প্রয়োজন বোধ করছেন না।)

এই চিঠির দ্রুত প্রাপ্তি স্বীকার করে আপনাদের বর্তমান কাজের ধারা জানালে উভয়ের পক্ষেই সেটা কাজের হবে।

(মূর্খ! একখানা সস্তাদরের, বাজে কাগজে লেখা চিঠি পাঠিয়েছেন-চৈত্রের ঝরাপাতার মতো একখানা চিঠি–তার উপর আমি যখন বন্ধক, ব্লাড প্রেসার পাকার উৎপাত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন আবার বলার স্পর্ধা দেখিয়েছেন আপনার ওই বাজে চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করতে–তাও আবার দ্রুত'! আপনার কি জানা আছে আপনার মতো আমিও ব্যস্ত হুকুম করার সাহস কোথায় পেলেন? আপনি বলেছেন, এটা উভয়ের পক্ষেই কাজের হবে। শেষপর্যন্ত তাহলে আমার মনটা বুঝতে পেরেছেন দেখছি। তবে আমার কি সুবিধা হবে সে ব্যাপারটা ধোঁয়ার মতই রয়ে গেছে।)

আপনার বিশ্বস্ত,
জন ব্ল্যাঙ্ক ম্যানেজার,
বেতার দপ্তর।

'পুনশ্চ : ভিতরে পাঠানো ব্ল্যাঙ্কভিল পুস্তিকাটি আপনার আগ্রহ জাগাতে পারে, আর এটা আপনি রেডিওতে ঘোষণার ব্যবস্থাও করতে পারবেন।

(শেষপর্যন্ত পুনশ্চতে যা লিখেছেন তাতে আমার কোন সমস্যার সমাধান হতেও পারে। আপনি এটা দিয়েই তো চিঠিটা শুরু করতে পারতেন–কিন্তু কি লাভ? যে-কোনো বিজ্ঞাপন দপ্তরের লোক এমন চিঠি লিখতে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগে।

আমাদের ইদানীং কালের কাজের বিবরণ লেখা চিঠি পেয়ে আপনার কোনো কাজই হবে না–আপনার দরকার হল আপনার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের জন্য খানিকটা আয়োডিন।)

এখন ধরুন, বিজ্ঞাপন ব্যবসাতেই জীবন কাটাচ্ছেন আর মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন বলে আত্মশ্লাঘা আছে এমন একজনের কাছ থেকেই যদি এরকম চিঠি আসে তাহলে আমাদের মাংসওয়ালা, রুটিওয়ালা বা কার্পেট সারাইওয়ালার কাছ থেকে কেমন আশা করব?

আর একখানা চিঠির উদাহরণ দেখুন। এ চিঠিটা লিখেছিলেন এই বিষয়ের একজন ছাত্রকে জনৈক মালপরিবহণ কোম্পানির সুপারিন্টেন্ডেন্ট। যাকে লেখা হয়েছিল তার মনে এটা কি রকম প্রভাব ফেলেছিল? আগে চিঠিটা পড়ুন তারপর বলছি।

‘এ জেরেগাস সন্স ইনকরপোরেটড
২৮, ফ্রন্ট স্ট্রীট, ব্রুকলীন, এন, ওয়াই।
‘মি. এডওয়ার্ড ভার্মিলেন সমীপেষু।

জনাব,
আমাদের বহির্গামী রেলপথের মাল গ্রহণ কেন্দ্রে অপরাহ্নে মাল পাঠানোর জন্য বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। এই সবের ফলে দেখা দিচ্ছে ভিড়, আমাদের কর্মীদের ওভারটাইম, ট্রাকের জন্য দেরি আর কোন কোন ক্ষেত্রে মাল পাঠানোয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। ১০ই নভেম্বর আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৫১০ পেটি মাল আসে প্রায় বিকেল ৪-২০ মিনিটে।

আমরা এইসব কাজের আর দেরিতে মাল পরিবহণের অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে আপনার সহযোগিতা কামনা করি। আমরা কি এই অনুরোধ জানতে পারি এরপর যখন এই রকম বেশি পরিমাণে মাল পাঠাবেন সেগুলি ট্রাকে বিকেলের আগেই পাঠাবেন বা অন্ততঃ কিছু পরিমাণ আগেই পাঠাবেন?

এই রকম ব্যবস্থায় আপনাদের যে সুবিধা লাভ হবে তা হল আপনাদের ট্রাক আরো দ্রুত খালি হতে পারবে, আর আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আপনাদের ট্রাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গেই খালি করে দেয়া হবে।

আপনার অতি বিশ্বস্ত,
জে. বি. সুপারিন্টেডেন্ট।

চিঠিটা পড়ার পর এ. জেরেগাস কোম্পানির সেলস্ ম্যানেজার মি. ভার্মিলেন সেটা আমার কাছে নিচের মন্তব্যসহ পাঠিয়ে দেন :

'যা চাওয়া হয়েছিল এ চিঠিটায় ঠিক তার উল্টো ফল হয়। চিঠিটা শুরু করা হয়েছে মাল খালাস ইত্যাদির অসুবিধা জানিয়ে, তবে বলতে গেলে এ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমাদের কোনো অসুবিধার কথা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অনুরোধ জানানো হয়েছে যে, আমরা সহযোগিতা করলে ট্রাক দ্রুত খালাস করে ওইদিনেই মাল পাঠানো হবে।

'অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ আছে সেটা সবার শেষে লেখা হয়েছে আর চিঠিটা সহযোগিতার না হয়ে শত্রুতাপূর্ণই হয়ে উঠেছে।

এবারে দেখা যাক। আসুন, এ চিঠিটা আবার নতুন করে লিখে আরো ভালো করা যায় কিনা। আমাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। হেনরি ফোর্ড যেমন বলেছিলেন : সব সময় অপরজনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবেন, সঙ্গে নিজেদেরও।'

নিচে চিঠিটা ঘুরিয়ে লেখার উদাহরণ দিচ্ছি। এটাই হয়তো সবচেয়ে ভালো নয়, তবে অবশ্যই কিছুটা উন্নত, কি বলেন?

মি. এডওয়ার্ড ভার্মিলেন,
অ/এ. জেরেগাস সন্স ইনকং।
২৮ ফ্রন্ট স্ট্রিট,
ব্রুকলীন, এন, ওয়াই।

প্রিয় মি. ভার্মিলেন,
গত চৌদ্দ বছর যাবত আপনার প্রতিষ্ঠান আমাদের একজন ভালো মক্কেল হয়ে আছেন। স্বভাবতই তাই আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাই আপনাদের যা প্রয়োজন সেই দ্রুত পরিচ্ছন্ন কাজ করার করতে প্রস্তুত। যাইহোক আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এটা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব যদি আপনাদের ট্রাক প্রচুর মালসহ বিকেলের অনেক পরে আসে, যেমন এসেছিল ১০ই নভেম্বর। কেন? তার কারণ অন্যান্য খরিদ্দারও তাই করে থাকেন। স্বভাবতই এর ফলে ভিড় জমতে থাকে। এর অর্থ হল অনিবার্য ভাবেই আপনাদের ট্রাক জেটিতে আটকে যায়, আর অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের মাল পরিবহনে দেরিও হয়ে যায়।

এটা বড়ই খারাপ। এটা কেমন করে এড়ানো যায়? এটা সম্ভব আপনাদের মাল বিকেলের আগেই জেটিতে পৌঁছে দেয়া। এতে সব কাজ দ্রুত হতে পারবে, আপনাদের মাল আমাদের নজরে থাকবে আর আমাদের কর্মচারিরাও তাড়াতাড়ি রাতের আগে বাড়ি ফিরে আপনাদের তৈরি সুস্বাদু ম্যাকারনি আর লুডলস্ সহযোগে নৈশভোগ সারবে।

আমার অনুরোধ এ চিঠিকে কোনো অভিযোগ বলে ভাবনে না, আর এটাও ভাববেন না আপনাদের ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে মাথা গলাচ্ছি।

যখনই আপনারা মাল পাঠান না কেন আমরা আনন্দের সঙ্গেই যথাসাধ্য আপনাদের সেবায় নিয়োজিত থাকব।

আপনারা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। দয়া করে এই চিঠির উত্তর দিতে চাইবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত জে-বি,
সুপারিন্টেডেন্ট।

আজকের দিনে হাজার হাজার বিক্রেতা রাস্তার ধারে ক্লান্ত, ভগ্ন মনোরথ অল্প মাইনেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন? তার কারণ তারা সর্বদাই নিজেরা কি চায় সে কথাই ভেবে চলে। তারা উপলব্ধিই করতে পারে না আপনি বা আমি কিছু কিনতে আগ্রহী নই। আমরা যদি চাইতাম তাহলে বাইরে গিয়ে কিনে আনতাম। কিন্তু আমি বা আপনি চিরায়ত পথেই নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে ব্যস্ত। অবশ্য কোনো বিক্রেতা যদি আমাদের দেখিয়ে দিতে পারে তার সাহায্য বা জিনিস আমাদের সমস্যা সমাধানে কতটা সাহায্য

করতে পারবে তাহলে তাকে আমাদের কাছে বিক্রি করতে হবে না। আমরাই কিনব। আর একজন খরিদ্দার এটাই ভাবে সে ক্রয় করছে-তাকে বিক্রি করা হচ্ছে না।

এ সত্ত্বেও কিন্তু বহু লোকই সারা জীবন বিক্রির চেষ্টায় কাটাতে চায়-তারা সবকিছু ক্রেতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায় না। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি–আমি গ্রেটার নিউইয়র্কের ফরেস্ট হিল এলাকাতে থাকি। একদিন যখন স্টেশনে ছুটছিলাম তখন একজনের সঙ্গে আমার দেখা হল-লোকটি বহুদিন যাবত লং আইল্যান্ডে জমির কেনা বেচা করে কাটিয়েছেন। ফরেস্ট হিল এলাকা তার ভালোই জানা ছিল তাই আমি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম আমার বাড়িটি কি দিয়ে বানান-ধাতব পাত না ফাঁপা টালি। সে জানাল ওটা তার জানা নেই, বরং তিনি যা বললেন সেটা আমার আগে থেকেই জানা। এটা আমি নিজেই ফরেস্ট হিলস গার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনকে ফোন করেই জানতে পারি। পরের দিন সকালে লোকটির কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিতে আমি যা জানতে পেরেছিলাম সেটাই তিনি দিয়েছিলেন কি? সেটা তিনি ষাট সেকেন্ডের মধ্যেই একটা টেলিফোন করেই জানতে পারতেন। তিনি তা করেন নি। তিনি বরং লিখেছিলেন আমি যেন আমার বীমার ব্যাপারটা তাকেই দেখতে দিই।

আমাকে সাহায্য করতে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি শুধু নিজেকেই সাহায্য করতে চাইছিলেন। আমার উচিত ছিল ওকে ভ্যাস ইয়ং-এর চমৎকার বই, ‘এ গো গিভার’ আর ‘এ ফরচুন টু শেয়ার’ পড়তে দেয়া। তিনি বই দুটো পড়ে বইয়ের বক্তব্য অনুসরণ করলে আমার বীমার কাজ করার চেয়ে হাজার গুণ বেশি লাভ করতেন।

পেশাদার মানুষরাও একই ভুল করে থাকেন। বেশ কয়েক বছর আগে আমি ফিলাডেলফিয়ার একজন নামী নাক আর গলা বিশেষজ্ঞর কাছে যাই। লোকটি আমার টনসিলটা না দেখেই প্রশ্ন করেছিলেন আমার কাজকর্ম কি। আমার টনসিলের আকার নিয়ে তার কোনোই মাথা ব্যথা ছিল না। তার আগ্রহ ছিল আমার টাকা দেবার ক্ষমতার সম্বন্ধে। আমাকে কতটা সাহায্য করতে পারেন না ভেবে তিনি ভাবছিলেন আমার কাছ থেকে কত আদায় করতে পারবেন। ফল দাঁড়াল তিনি কিছুই পেলেন না। আমি তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাবের নিন্দা করে।

পৃথিবীটাই এইরকম মানুষে ভর্তি, শুধু লোভী আর স্বার্থপর। তাই নিঃশ্বার্থভাবে অন্যের সাহায্যে তৎপর এমন লোক বড় কম, অথচ অন্যের চেয়ে তাদের প্রচুর সুবিধা আছে। তার প্রতিযোগিতা থাকে সামান্য। ওয়েন ডি. ইয়ং বলেছিলেন : 'যে ব্যক্তি অন্যের জায়গায় নিজেকে ভাবতে পারেন, অন্যের ভাবনা নিজের করতে পারেন ভবিষ্যতে তাঁর কোনো ভাবনা থাকে না।

এই বইটি পাঠ করার পর আপনি যদি শুধু একটা জিনিসই পান, শুধু বেশি করে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করা, আর তার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা-এই একটামাত্র জিনিস বইটা থেকে পেলে সেটাই হবে আপনার জীবনের একটা সোপান।

বেশিরভাগ কলেজে যান ভার্জিল পাঠ করতে আর ক্যালকুলাসের রহস্যের মতো বিষয়ে ওস্তাদ হতে, তারা নিজেদের মন কীভাবে কাজ করে আদৌ ভাবেন না। যেমন ধরুন, আমি একবার ঠিক মতো বক্তৃতা করার বিষয়ে একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করি–এটা করা হয় নিউ জার্সির নেওয়ার্কের ক্যারিয়ার কর্পোরেশনে কাজ যোগদানের জন্য তৈরি কিছু

কলেজ ছাত্রের জন্য। তাদের কাজ হল তাপনিয়ন্ত্রণ জিনিসপত্র তৈরি। তাদের একজন অন্যান্যদের বাস্কেটবল খেলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। তার নিজের কথাটা ছিল এই রকম : আমার ইচ্ছে আপনারা বেরিয়ে এসে বাস্কেটবল খেলতে চলুন। আমার খেলাটা ভালো লাগে, কয়েকবার জিমনেসিয়ামে গেলেও খেলতে পারি নি লোক ছিল না বলে। কিছুদিন দুই তিনজন মিলে বল ছুঁড়তে গিয়ে চোখটা প্রায় কানা হবার মতো হয়েছিল। আমার ইচ্ছে আগামীকাল আপনারা সবাই চলুন বাস্কেটবল খেলা যাবে, আমার এটা খেলতে খুব ইচ্ছে।'

সে কি আপনারা কি চান একবারও বলেছে? আপনারা কেউই জিমনাসিয়ামে যেতে চান না, তাই না? সে যা চায় তাও খেলতে চান না। চোখ কানা হোক তাও কেউ বোধ হয় চাইবেন না।

সে কি জিমনাসিয়ামে গেলে আপনাদের কি উপকার হত সে কথা বোঝাতে পারত? নিশ্চয়ই পারত। এতে শরীর চালনা দ্রুত হতে পারে, এতে ক্ষিদে হয়। মাথা সাফ হয়ে। মজা পাওয়া যায়। হৈ চৈ খেলাধুলো করা যায়, বাস্কেটবলও খেলা যায়।

প্রফেসর ওভারস্ট্রিটের কথাটা একবার শুনুন। তার কথা হল : প্রথমে অন্যজনের মধ্যে একটা সাগ্রহ চাহিদা বাড়িয়ে তুলুন। যে এটা পারে সারা পৃথিবীই তার সঙ্গে থাকে। যে তা পারে না তাকে একলাই চলতে হবে।'

আমার শিক্ষানবীসদের মধ্যে একজন তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিলেন। ছেলের ওজন কম ছিল, সে ঠিকমত খেতেও চাইত না। তার বাবা মা

লোকে যা বলে তাই করছিলেন। ছেলেকে বকাবকি করছিলেন। মা তোমাকে এটা খেতে বলেছে' বা 'বাবা তোমাকে মস্ত বড় হয়ে উঠতে বলেছেন।

ছেলেটা কি ওইসব গুজবে কান দিয়েছে? একটুও না। যার মাথায় ছিটে ফোঁটা বুদ্ধিও থাকে তিনি বুঝতে পারেন তিন বছরের একটা ছেলে আর ত্রিশ বছরের বাবার দৃষ্টিভঙ্গি এক হতে পারে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু এক্ষেত্রে ছেলেটির বাবা তাই চাইছিল। এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার। এটা অবশ্য শেষপর্যন্ত তার খেয়াল হয়। তাই তিনি নিজেকে বললেন : 'ছেলেটা কি চায়? ও যা চায় আর আমি যা চাই দুটোকে মেলাব কেমন করে?

চিন্তা শুরু করতেই ব্যাপারটা তার কাছে সহজই হয়ে গেল। তার ছেলের একটা তিন চাকার সাইকেল ছিল, সেটায় চড়ে সে তাদের ব্রুকলিনের বাড়িয়ের পাশের রাস্তায় চলতে চাইত। কয়টা বাড়ির পরে রাস্তায় এক দুষ্ট ছেলে থাকত–তার ছেলের চেয়ে বয়সে সে বড়। সে তার ছেলেকে ওই সাইকেল থেকে টেনে নামিয়ে নিজেই সেটা চালাত।

স্বভাবতই ছোট্ট ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে ছুটে এসে বলতেই তার মা আবার গিয়ে সেই শয়তান ছেলেটাকে সাইকেল থেকে টেনে নামিয়ে ওকে চড়িয়ে দিতেন। এরকমই প্রায় রোজ ঘটত।

বাচ্চাটি কি চাইত? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শার্লক হোমসের সাহায্যের দরকার হয় না। ওর অহঙ্কার, ওর রাগ, নিজেকে বড় বলে মনে করা ওর মনের এই সব আবেগই ওর মনে খেলে যেতে চাইত–আর সেটা ওকে প্রতিশোধ নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করত, সেই

শয়তান ছেলেটির নাক ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে জাগত। তার বাবা এর পর যখন বাচ্চাটিকে বুঝিয়েছিল সে যদি ওর মার কথামত ঠিকঠিক খেয়ে নেয়, তাহলে আর কিছুদিনের মধ্যেই ও বড় হয়ে সেই শয়তান বড় ছেলেটার নাক ভেঙে একেবারে সায়েস্তা করে দিতে পারবে-ব্যাস্ এরপর তাকে খাওয়ানোর ব্যাপারে আর কোন সমস্যাই রইল না। সে তখন সব খাবারই ঠিক ঠিক খেতে শুরু করল, ক্রমে তরিতরকারি, মাছ যাই থাকুক। আর এর কারণ হল ওর চেয়ে বড় একটা ছেলেকে ও ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল যে ওকে সবসময় জ্বালাতন করত।

এই সমস্যার সমাধান করার পর তার বাবা তার একটা সমস্যা সমাধানে নামলেন। বাচ্চা ছেলেটি প্রায়ই বিছানা ভিজিয়ে ফেলত।

বাচ্চাটি ঘুমোত ওর দাদির কাছে। সকাল বেলায় দাদি উঠে বিছানার অবস্থা লক্ষ্য করে ওকে বলতেন, "দেখ জনি, রাত্তিরে আবার কি করেছি।'

ছেলেটা জবাব দিত : না না, আমি করি নি, তুমি করেছ।

ওকে বকুনি দিয়ে, মারধর করে নানা রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়েও কিন্তু বিছানা শুকনো রাখা যাচ্ছিল না। অতএব তার বাবা-মা স্বভাবতই প্রশ্ন তুললেন : 'ছেলেটাকে দিয়ে কেমন করে এই নোঙরা কাজ বন্ধ করাব।?'

ছেলেটার ইচ্ছেটা কি ছিল? প্রথমতঃ সে চাইত তার বাবার মতো পাজামা পরতে, দাদির মতো রাতের গাউন তার একটুও ভালো লাগত না। দাদি ওই বিছানা ভেজান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, অতএব নাতির জন্যে রাতের পাজামা এসে গেল বেশ

আনন্দের সঙ্গেই। আশা যদি ও বদলে যায়। দ্বিতীয়তঃ ছেলেটি আরো চাইত নিজের একটা বিছানা। দাদি তাতেও আপত্তি করলেন না।

ওর মা ওকে ব্রুকলিনের একটা বড় দোকানে নিয়ে গিয়ে সেলস্ গার্লকে চোখ টিপে বললেন : এই ছোট্ট ভদ্রলোক কিছু কেনাকাটা করবেন।

মেয়েটিও ওর শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগাতে চেয়ে বলল, 'বল, তোমাকে কি দেখাব?'

ছেলেটি পা উঁচু করে একটু লম্বা হয়ে বলল, 'আমি আমার জন্য একটা বিছানা চাই।'

ওর মা মেয়েটিকে একটা বিছানা দেখিয়ে চোখ টিপলেন। আর ছেলেটিকে সে সেটাই পছন্দ করাল। আর তাই কেনাও হয়ে গেল।

বিছানাটি পরের দিন পৌঁছে গেল বাড়িতে। রাতের বেলা বাবা বাড়িতে আসতেই ছেলেটি দরজার কাছে এসে চিৎকার করে বলল, 'বাবা! বাবা! উপরে এসে আমার বিছানা দেখে যাও, আমি নিজে কিনেছি।'

বাবা চার্লস্ শোয়াবের কথাটাই মেনে চললেন। অর্থাৎ দারুণ খুশি হয়ে প্রশংসা করে চললেন খুদে ভদ্রলোকের।

'এ বিছানাটা নিশ্চয়ই ভেজাবে না, কি বল?' বাবা এবার বললেন।

'ওঃ না, না। কখনো এ বিছানা ভেজাব না।' ছেলেটি অবশ্যই তার কথা রেখেছিল যেহেতু তার গব এর উপর নির্ভর করছিল। বিছানাটা যে ওর নিজের। তাছাড়া সে এক

খুদে ভদ্রলোকের মতো পাজামাও পরেছিল। সে তাই বড়সড় একজন মানুষের মতো ব্যবহার করতে চাইছল। আর তা করেও ছিল।

আর একজন বাবা, একজন টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার, আমারই একজন ছাত্র, তার তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়েন। মেয়েটি তার প্রাতরাশ খেতে চাইত না একেবারেই। নানা রকম বকাবকি, অনুরোধ কোনো কিছুতেই কাজ হল না। অতএব তার বাবা মা স্বভাবতই প্রশ্ন করলেন : 'কি করে আমাদের ছোট্ট মেয়েকে প্রাতরাশ খাওয়াব?'

বাচ্চা মেয়েটি ওর মাকে নকল করতে ভালোবাসতো। সে সবসময়েই নিজেকে মার মতো মস্ত বড় হয়ে গেছে বলে ভাবতে চাইত। অতএব ওর বাবা মা একদিন তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে প্রাতরাশ বানাতে দিলেন। আর ঠিক মনস্তাত্ত্বিক সময়টাকে মেয়েটির বাবা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন, সে তখন খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে বলে উঠল : 'ওঃ দেখ বাবা, আমি আজ সকালের মল্টেক্স বানাচ্ছি।'

এরপর সেদিন সকালে তাকে খাওয়ানোর জন্য একটুও কষ্ট পেতে হল না। সে সবই খেয়ে নিল কারণ আজ তার আগ্রহ জেগেছিল। সে নিজের সম্বন্ধে বেশ গর্ব বোধ করতে শুরু করেছিল। নিজেকে জাহির করার একটা উপায়ই মেয়েটি পেয়ে যায় খাবার বানানোর মধ্য দিয়ে।

উইলিয়াম উইন্টার একবার বলেছিলেন : নিজেকে প্রকাশ করা মানুষের চরিত্রের একটা প্রধানতম দিক।আমরা ব্যবসার ব্যাপারে এই মনস্তত্ত্ব কেন কাজে লাগাতে পারি না? যখন

কোনো একটা চমৎকার ধারণা আমাদের মাথায় খেলে যায়, তখন অন্য লোকদের কাছে সেটা যে আমাদের না জাগিয়ে সেটা তাদেরই এমন ধারণা ভাবিয়ে দিলেই তো ভালো হতে পারে? সে তখন সেটা তার নিজের বলেই ভাবতে চাইবে, আর এতেই সে কাজ করতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হবে।

মনে রাখবেন : প্রথমেই অন্য লোকটির মধ্যে বেশ কিছুটা আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। যে এটা পারে সারা দুনিয়াকেই সে সঙ্গে পেতে পারে। যে পারে না তাকে একা একাই পথ চলতে হবে।

এই বই থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পেতে হলে এই নয়টি পরামর্শ মেনে চলবেন :

১. আপনি যদি এই বইটি থেকে সবচেয়ে বেশি কিছু চান তাহলে একটি অপরিহার্য কাজ করতেই হবে। সেটা অন্য যে-কোনো রকম আইন, নীতি বা নিয়মের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা এমনই অপরিহার্য যে আপনার হাজার হাজার নিয়ম জানা থাকলেও কোনো কাজ হবে না। অন্যদিকে আপনার এই রাজকীয় জিনিসটি যদি থাকে তাহলে এই বইয়ের পরামর্শ না নিয়েই আশ্চর্যজনক ফলই পেতে পারবেন।

সেই জাদুকরী ব্যাপারটা কি রকম? সেটা হল এই : গভীর আর আন্তরিক শেখার পিপাসা, আর মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের কাজে নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এরকম আকাঙ্ক্ষা বাড়ানোর কাজটা কিভাবে গড়ে তোলা যাবে? এটা করা সম্ভব অনবরত নিজেকে বোঝান এই নীতিগুলো আপনার কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। নিজের মনেই এঁকে দেখতে থাকুন এ কাজে দক্ষতা অর্জন করলে কীভাবে আপনি

সামাজিক আর অর্থকরী লাভের কাজে সাফল্য পেতে পারবেন। বার বার আপনার নিজেকেই বলুন : 'আমার জনপ্রিয়তা, আমার সুখ আর আমার আয় নির্ভর করে মানুষের সঙ্গে আমার ব্যবহার করার দক্ষতারই উপর।'

২. প্রতিটি পরিচ্ছেদে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে একটা ধারণা করে ফেলুন। এরপরেই আপনার লোভ জাগবে পরেরটাতে দ্রুত এগুনোর জন্য। কিন্তু তা করবেন না। শুধু মানসিক আনন্দের জন্যই যদি না পাঠ করেন। কিন্তু জনসংযোগে দক্ষতা বাড়ানোর জন্যই যদি পাঠ করতে চান তাহলে প্রতিটি পরিচ্ছেদ বেশ ভালো করে বারবার পড়ুন। শেষপর্যন্ত দেখতে পাবেন তাতে সময় বাঁচান আর ফল লাভের ক্ষেত্রে কাজই হয়েছে।

৩. পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই একটু থেমে যা পড়রেন সেটা সম্পর্কে ভাবতে থাকুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন প্রতিটি উপদেশ কোথায় কখন কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এরকম ভাবে পড়লেই সবচেয়ে বেশি কাজ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই।

৪. পড়ার সময় যাতে লাল রঙের কোনো পেন্সিল বা পেন রাখবেন, যাতে পড়তে পড়তে এসব কোনো উপদেশ যদি দেখতে পান যেটা কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে সেটায় লাল কালির দাগ দিয়ে চিহ্নিত করুন। যদি সেই পরামর্শ বা উপদেশ খুবই ভালো মনে হয়, তাহলে তার তলায় লাইন টেনে পাশে চারটে তারা চিহ্ন দিন। লেখার তলায় লাইন আর এই রকম তারা চিহ্ন এইটিকে আরো আগ্রহের করে তোলে। তাছাড়া আবার পড়ার কাজেও সুবিধা হয়।

৫. আমি একজন ভদ্রলোককে চিনি যিনি পনের বছর ধরে বিরাট এক বীমা প্রতিষ্ঠানের অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি প্রতি মাসে তার প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত বীমার চুক্তি করে তার সব পড়ে ফেলতেন। হ্যাঁ, তিনি একই চুক্তিপত্র মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পড়ে যেতেন। কিন্তু কেন? কারণ তিনি তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছিলেন চুক্তির শর্তাবলি এই ভাবেই তিনি মনে রাখতে পারবেন।

আমি একসময় প্রায় দুই বছর ব্যয় করি জনগণের সামনের বক্তৃতা দেবার উপর একখানা বই লিখতে, তা সত্ত্বেও কিন্তু ওই বইটাতে কি লিখেছি মনে করার জন্য আমাকে প্রায়ই সে বইয়ের পাতা উল্টে দেখতে হয়। এ রকম দ্রুততায় যে আমরা সব ভুলে যাই ভাবলে অবাক হতে হয়। অতএব এ বইটি থেকে যদি সত্যিকার চিরকালীন কোনো উপকার পেতে চান, তাহলে মনেও ভাববেন না যে একবারের মতো শুধু পড়ে ফেললেই যথেষ্ট হবে। বেশ ভালো করে পড়ে ফেলার পর প্রতি মাসে বেশ ভালো করে আপনাকে কয়েক ঘণ্টা আবার এই বইয়ের সবকিছু আলোচনা করতে হবে। বইটা আপনার ডেস্কে চোখের সামনে রেখে দিন। প্রতিদিন সময় পেলেই একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন। প্রতিদিন নিজেকে বোঝাতে চান আপনার নিজের উন্নতি করার আশাতিরিক্ত সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন, এই পরামর্শ আর নিয়মগুলো বারবার পড়া আর আলোচনার মধ্য দিয়েই সেগুলো সহজ হয়ে আসবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

৬. বার্নার্ড শ একবার বলেছিলেন : কোনো মানুষকে কিছু শেখাতে চাইলে সে কিছুতেই শিখবে না। বার্নার্ড শ ঠিকই বলেছিলেন। যেহেতু শেখা ব্যাপারটা ব্যবহারিক। আমরা কাজ করতে করতেই শিখি। অতএব, এই বই থেকে যে নিয়মগুলো আপনি শিখতে চান সেগুলো সম্বন্ধে কিছু করার চেষ্টা করুন। সুযোগ পেলেই নিয়মগুলো কাজে লাগান। তা

না করলে, খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো ভুলে যাবেন। যে জ্ঞান কাজে লাগানো যায় তাই কেবল মনে থাকে।

এই উপদেশগুলো আপনি হয়তো সবসময় কাজে লাগাতে গিয়ে অসুবিধা বোধ করতে পারেন। আমি এটা জানি, কারণ বইটা আমারই লেখা, আমি নিজেই প্রায়ই যা বলেছি তার সব প্রয়োগ করতে অসুবিধা বোধ করি। উদাহরণ হিসেবে বলছি, আপনি যখন অসন্তুষ্ট হন তখন অপরের মন বুঝে নেয়ার চেয়ে সমালোচনা করা বা তাকে দোষ দেয়া অনেক সহজ কাজই হয়। অপরের দোষ খুঁজে নেয়া প্রশংসা করার চেয়ে ঢের সহজ। আপনি যা চান সেটার সম্বন্ধে বলা অপরে কি চায় সেটা বলার চেয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক। এরকম আরো আছে। অতএব এই বই পড়ে চলার ফাঁকে, মনে। রাখবেন, যে আপনি কেবল খবরাখবর সংগ্রহ করছেন না, আপনি চাইছেন, নতুন অভ্যাস গড়ে তুলতে। হ্যাঁ, আপনি নতুন জীবনবেদ গড়ে তুলতে চলেছেন। এজন্য চাই সময়, ধৈর্য আর প্রাত্যহিক প্রয়োগ।

অতএব এই পাতাগুলো অনবরত দেখুন। এটাকে জনসংযোগের ক্ষেত্রে একটা ব্যবহারিক বই হিসেবেই ভাবতে শুরু করুন–আর যখনই আপনি কোনো বিশিষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হবেন-যেমন কোনো শিশুর সঙ্গে ব্যবহার, আপনার স্ত্রীকে স্বমতে আনা বা কোনো অসন্তুষ্ট মক্কেলকে সন্তুষ্ট করা–তখনই স্বাভাবিক আর চট করে যে ভাবনা আসে সেটা করবেন না। তাতে সাধারণতঃ ভুলই করা হবে। এর বদলে এ বইয়ের পাতাগুলো উল্টে যেখানে লাইনের তলায় দাগ দিয়ে রেখেছেন। সেগুলো একটু দেখে নিন। তারপর ওই নতুন পদ্ধতি কাজে লাগান, দেখবেন তাতে জাদুর মতো। কাজ হচ্ছে।

৭. আপনার স্ত্রী, ছেলে বা কাজের সহকর্মীকে প্রত্যেকদিন আপনি এ বইয়ের নিয়ম ভঙ্গ করছেন দেখিয়ে দিলে তাদের এক ডলার করে দেবার ব্যবস্থা করুন। এই নিয়মগুলো আয়ত্ত করার ব্যাপারটা একটা খেলার পর্যায়ে এনে ফেলুন।

৮. ওয়াল স্টিটের কোনো এক বিখ্যাত ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট আমার ক্লাসে একবার বর্ণনা করেছিলেন, আত্মউন্নতির জন্য তিনি কি রকম চমৎকার এক পথ অবলম্বন করতেন। ভদ্রলোক ছেলেবেলায়। তেমন লেখাপড়ায় সুযোগ পান নি, তা সত্ত্বেও তিনি আমেরিকার একজন বিখ্যাত অর্থ বিনিয়োগকারী, তিনি স্বীকার করেন যে তাঁর সাফল্যের জন্য দায়ী তার নিজেরই আবিষ্কার করা এই পদ্ধতি। তিনি যা করতেন তা হল এই রকম। যতটা আমার মনে আছে তাঁর নিজের কথাতেই জানাচ্ছি :

বছরের পর বছর আমি রোজ আমার যে সব সাক্ষাৎকার ঘটত তার একটা বিবরণ লিখে রাখতাম। আমার পরিবারের লোকজন শনিবারের রাতে আমার জন্য কোনোরকম পরিকল্পনা রাখতে না, কারণ তারা জানত শনিবার আমি কাটাই আত্মসমীক্ষা আর সমালোচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে জানার চেষ্টা করি। নৈশভোজের পর আমি সেই দেখা সাক্ষাতের বিবরণ লেখা বইটা খুলে সারাদিনের সাক্ষাৎ, আলোচনা, সভা ইত্যাদি নিয়ে সমস্ত সপ্তাহের ব্যাপারটা পড়ে ফেলি। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করি :

“ওই দিনে কি ভুল করেছি?”

“কোন কাজটা আমি ঠিক করেছি–আর আরো ভালো ভাবে কাজটা কেমন করে করতে পারতাম?”

“ওই অভিজ্ঞতা থেকে কি শিক্ষা পেতে পারি?”

আমি প্রায়ই দেখতে পেয়েছি ওই সমালোচনায় আমি দুঃখই পেয়েছি। আমার নিজের ভুল দেখে আমি প্রায়ই অবাক হয়েছি। অবশ্য, বছর ঘুরে চললে দেখেছি এরকম ভুলের সংখ্যা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে এই রকম বিচার করার পর নিজেকেই আমার প্রশংসা করতে ইচ্ছে জেগেছে। এই রকম আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম-সমালোচনা বছরের পর বছর করার ফলে অন্য সবকিছুর চেয়ে আমার ঢের বেশি উপকার হয়েছে।

‘এটা আমাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আমার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছেন–আর এটা জনসংযোগের কাজে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু আমি ভাবতে অপরাগ।

আপনিও এই রকম পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে, এই বইয়ের নীতির ব্যবহারিক করুন না কেন? এটা করলে দুটো ফল লাভ হবে।

প্রথমতঃ আপনি নিজেকে বেশ অদ্ভুত আর অমূল্য কোনো শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত দেখতে পাবেন।

দ্বিতীয়তঃ আপনি দেখতে পাবেন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার কাজে আপনার দক্ষতা বর্ষাকালের চারাগাছের মতোই হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে।

৯. একটা ডায়েরি লেখার অভ্যাস করুন-যে ডায়েরিতে আপনি আপনার এই নিয়ম মেনে চলায় প্রাপ্ত সাফল্যের হিসাব রাখবেন। খুব স্পষ্ট ভাবেই লিখবেন। এতে দেবেন, নাম,

তারিখ, ফলাফল ইত্যাদি। এরকম তালিকা রাখার ফলে আরো কাজ করার প্রেরণা পাবেন। বেশ কয়েক বছর পরে ডায়েরির পাতায় একবার যখন চোখ বুলিয়ে নেবেন তখন কি চমৎকার তৃপ্তিই না পাবেন।

এই বই থেকে সবচেয়ে বেশি ফল পেতে গেলে এই কথাগুলো মনে রাখবেন :

১. মানবিক সম্পর্কের নীতির সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জনের জন্য এক গভীর আকাঙ্ক্ষা গড়ে তুলুন।

২. পরবর্তী পরিচ্ছেদ পাঠ করার আগে প্রতিটি পরিচ্ছেদ দুইবার পড়ুন।

৩. পড়ে ফেলার ফাঁকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন প্রতিটি উপদেশ কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

৪. প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার তলায় দাগ দিন।

৫. প্রতি মাসে বইটি পর্যালোচনা করুন।

৬. সুযোগ পেলেই নীতিগুলো কাজে লাগান। আপনার দৈহিক সমস্যা মেটানোর কাজে এই বইকে কাজে লাগান।

৭. নিজের ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন।

৮. প্রতি সপ্তাহে কতটা এগোলেন তার হিসাব নিন। কী কী ভুল করলেন আর উন্নতির করেছেন তার হিসাব রাখুন।

৯. নিয়মগুলি কী রকম কাজে লাগালেন তার জন্য ডায়েরি রাখুন। মনে রাখবেন : প্রথমেই অন্য লোকটির মধ্যে বেশ কিছুটা আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। যে এটা পারে সারা দুনিয়াকেই সে সঙ্গে পেতে পারে। যে পারে না তাকে একা একাই পথ চলতে হবে।

১১. বন্ধুত্ব লাভের সহজ পথ

কি করে বন্ধু পেতে হয় জানার জন্য এ বই পড়ার দরকার কি? পৃথিবীর সব সেরা বন্ধুত্ব অর্জন করা মানুষটির কৌশলটাই একবার পড়ে ফেলুন না কেন? সে কে জানেন না? হয়তো আগামীকালই তাকে দেখবেন রাস্তা দিয়ে আসছেন আর তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যাবে। আপনি তার দশফিটের মধ্যে আসতেই সে তার ল্যাজ নাড়তে চাইবে। আপনি তাকে থামিয়ে তার পিঠ চাপড়ে আদর করলেই সে প্রায় লাফিয়ে উঠে জানিয়ে দেবে আপনাকে সে কতখানি পছন্দ করে। আপনিও বুঝতে পারবেন তার এই আনন্দ প্রকাশের মধ্যে কোনোরকম উদ্দেশ্য একেবারেই নেই। সে আপনাকে কোনো কিছু বিক্রি করতে চায় না বা আপনাকে বিয়ে করতেও চায় না।

কোনোদিন কী একবার ভাবতে চেয়েছেন একমাত্র কুকুরকেই জীবন ধারণের জন্য কোনোরকম কাজ করতে হয় না? মুরগিকে ডিম পাড়তে হয়, গরুকে দুধ দিতে হয়, কানারি পাখিকে গান গাইতে হয়। কিন্তু কুকুর বেঁচে থাকার জন্যে আপনাকে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই দেয় না।

আমার যখন পাঁচ বছর বয়স আমার বাবা পনের সেন্ট দিয়ে হলদে লোমওয়ালা একটা কুকুর ছানা এনে দিয়েছিলেন। এই কুকুর ছানাটা আমার ছোটবেলার সারাক্ষণে আনন্দ সঙ্গী ছিল। প্রত্যেক দিন বিকালে প্রায় সাড়ে চারটের সময় সে বাগানের সামনে তার সুন্দর চোখ মেলে আমার অপেক্ষা পথ চেয়ে বসে থাকত। আর আমার গল্প শুনতে

পেলেই প্রায় বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে এসে দারুণ আনন্দে আমাকে তার খুশির ভাব জানিয়ে চিৎকার করে চলত।

টিপি প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমার সারাক্ষণের সঙ্গী ছিল। তারপর এক দুঃখময় রাত্তিরে কোনোদিন সে রাতের কথা ভুলব না-সে আমার মাত্র দশ ফিটের মধ্যে বাজ পড়ে মারা যায়। টিপির মৃত্যু আমার ছোটবেলার জীবনের একটা চরম শোকাবহ ঘটনা।

মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি কোনো বই পাঠ করোনি টিপি। এর দরকারও ছিল না। কোনো ঐশ্বরীক ক্ষমতার মধ্য দিয়েই তুমি জানতে অন্য মানুষদের সম্পর্কে আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করে লাভ হবে না।

এ সত্ত্বেও কিন্তু আমি জানি কত লোকেই না অন্য সকলকে তাদের প্রতি আগ্রহান্বিত করার চেষ্টায় প্রাণপাত করে চলে।

এটা অবশ্যই জানা কথা এতে কোনো কাজ হয় না। মানুষ আপনার সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহান্বিত নয়। তারা আমার প্রতিও না। তারা কেবল নিজেদের সম্পর্কেই শুধু আগ্রহান্বিত-সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে সবসময়েই।

নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানি একবার বেশ ধারাবাহিক টেলিফোন কথাবার্তা শুনে হিসেব করার চেষ্টা চালায় সবচেয়ে কোনো কথাটা বেশি ব্যবহার হয় জানার জন্য। ঠিকই আন্দাজ করেছেন আপনারা-কথাটা হল 'আমি' 'আমি'...হ্যাঁ, 'আমি' এই সর্বনামটাই ৫০০ টেলিফোনের কথাবার্তায় প্রায় ৩৯৯০ বার ব্যবহার হয়। ভাবুন শুধু 'আমি', 'আমি', 'আমি'...

যে গ্রুপ ছবিতে আপনিও আছেন সেটা হাতে নিয়ে সবার আগে কাকে দেখার চেষ্টা করেন বলুন তো?

আপনি যদি ভেবে থাকেন লোকে আনার প্রতি আগ্রহান্বিত তাহলে এই প্রশ্নটার জবাব দিন : আপনার আজ রাতে যদি মৃত্যু হয় তাহলে কতজন লোক আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আসবে।

লোকে কেন আপনার সম্পর্কে আগ্রহী হবে, প্রথমে তার সম্পর্কে আপনি যদি আগ্রহী না হন? এবার একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে আপনার উত্তরটা চটপট লিখে ফেলুন :

আমরা যদি কেবল লোককে আগ্রহী করার চেষ্টা করি আর আমাদের প্রতিও আগ্রহ জাগাতে চাই, তাহলে কখনই সত্যিকার কোনো বন্ধু পাব না। বন্ধু, সত্যিকার বন্ধু এভাবে পাওয়া যায় না।

নেপোলিয়ান এইভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। জোসেফাইনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : 'জোসেফাইন, মানুষ ভাগ্যবান হতে পারে আমি তাই হয়েছি, তবুও ঠিক এই মুহূর্তে, সারা পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই একজন যার উপর নির্ভর করতে পারি'। ঐতিহাসিকদের সন্দেহ আছে নেপোলিয়ান জোসেফাইনের উপরেও আস্থা রাখতে পেরেছিলেন কি না।

ভিয়েনার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ অ্যালফ্রেড অ্যাডলার 'হোয়াট লাইপ সুড মিন টু ইউ' নামে একটা বই লিখেছিলেন। বইটাতে তিনি লিখেছেন : যে বিশেষ লোক অন্যদের সম্পর্কে

আগ্রহী হতে চায় না সে পৃথিবীতে জীবন কাটাতে সবচেয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয় আর অন্যকেও আঘাত দেয়। এই ধরনের মানুষ থেকেই সবরকম মানবিক ব্যর্থতা জন্ম দেয়।'

মনস্তত্ত্বের উপর আপনারা প্রচুর ভালো ভালো বক্তব্য পাঠ করতে পারেন কিন্তু এরচেয়ে চমৎকার কোনো বক্তব্য খুঁজে পাবেন না। এক কথা বারবার বলতে চাই না তাহলেও অ্যাডলারের বক্তব্য এতই চমৎকার সারগর্ভ যে আবার বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

'যে বিশেষ লোক অন্যদের সম্পর্কে আগ্রহী হতে চায় না সে পৃথিবীতে জীবন কাটাতে সবচেয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয় আর অন্যকেও আঘাত দেয়।'

আমি একবার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটগল্প লেখার ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম আর এই ক্লাস চলার সময় 'কোলিয়ার্স পত্রিকার সম্পাদক আমাদের কিছু বলেছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর টেবিলে রোজ জমা পড়া ডজন ডজন ছোটগল্পের মধ্যে থেকে একটা মাত্র তুলে নিয়ে কিছু অংশ পড়লেই তিনি বুঝতে পারেন লেখক মানুষকে ভালোবাসেন কিনা। তিনি বলেন : লেখক যদি মানুষকে ভালো না বাসেন তাহলেও মানুষও তাঁর গল্প ভালোবাসবে না।' ওই অভিজ্ঞ সম্পাদক ছোটগল্প নিয়ে কথা বলার সঙ্গে দুইবার থেকে মার্জনা চেয়ে বলেন তিনি একটা উপদেশ দিতে চান। তাঁর কথায় সেটা হল এই রকম : আমি আপনাদের যা বলছি আপনাদের কেউ কেউ হয়তো তাই বলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা যদি সফল গল্প লেখক হতে চান তাহলে মানুষ সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহ থাকতেই হবে।

কল্পিত কাহিনী লেখার ক্ষেত্রে এটা যদি সত্য হয় তাহলে মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে এটা তিনগুণ বেশি সত্যি।

আমি একবার হাওয়ার্ড থানের সঙ্গে তাঁর সাজঘরে একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম। ব্রডওয়েতে তিনি সে বার শেষবারের মতো প্রদর্শনীতে অংশ নেন। থান ছিলেন সেকালের বিখ্যাত একজন জাদুকর। তিনি একেবারে জাদুর কিংবদন্তী ছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে বারবার তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে মানুষকে তাঁর অলৌকিক জাদুর খেলা দেখিয়ে মুগ্ধ বিস্মিত করে তোলেন–মানুষ প্রায় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকত। ষাট লক্ষেরও বেশি মানুষ তার জাদু প্রদর্শন দেখার জন্য টিকিট কেটে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকে আর তিনি প্রায় বিশ লক্ষ ডলার লাভ করেন।

আমি থানের কাছে তাঁর সাফল্যের গোপন রহস্য কি জানতে চেয়েছিলাম। অবশ্য স্কুলে তাঁর লেখাপড়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই–যেহেতু ছোট বেলায় তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলেন। নানা জীবিকাই তিনি তারপর নেন–প্রথমে হন মজুর। গাড়ির মধ্যে খড়ের গাদায় ঘুমিয়েও ছিলেন। দরজায় দরজায় ভিক্ষেও করেছিলেন বেঁচে থাকার জন্য। তাছাড়া রাস্তার সাইনবোর্ড আর বিজ্ঞাপন পড়েই তার পড়াশোনায় হাতে খড়ি।

জাদুবিদ্যা সম্পর্কে কি তার দারুণ কোনো জ্ঞান ছিল? না। তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন, জাদুর খেলা বা ভোজবাজী সম্বন্ধে ঢের ঢের বই আছে আর তিনি যা জানেন বহু লোকও তাই জানে। কিন্তু তাঁর এমন দুটো জিনিস ছিল যা অন্য কারো ছিল না। প্রথমতঃ পাদপ্রদীপের সামনে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল। তিনি ছিলেন এক দক্ষ প্রদর্শক। মনুষ্যচরিত্র তার ভালোই জানা ছিল। তিনি যাই করতেন, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি,

কণ্ঠস্বরের বিবৃতি, সামান্য ভু তোলা–সবকিছুই খুব সতর্কতার সঙ্গে তিনি আগে থেকে অভ্যাস করে রাখতেন। আর তাঁর সমস্ত কায়দায় প্রায় সেকেন্ডের মধ্যে করতেন তিনি, একেবারে চোখের পলকে। কিন্তু এটাই তার সাফল্যের মূল আদৌ ছিল না। থার্স্টন মানুষ সম্পর্কে প্রকৃতই আগ্রহী ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, বহু জাদুরকই দর্শকদের লক্ষ্য করে নিজেদের বলতে চায় : হুম, আমার সামনে একদল গবেট বসে রয়েছে ওদের ঠিক বোকা বানাব। কিন্তু থার্স্টনের কৌশল ছিল একেবারে আলাদা। তিনি আমাকে বলেন-মঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেকে বলতেন, 'আমি কৃতজ্ঞ যে এতসব মানুষ আমার খেলা দেখতে এসেছেন। এঁরাই আমার জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে সম্ভব করে তুলেছেন। আর সেই কারণেই আমি ওঁদের আমার সব সেরা জাদুবিদ্যাই যথা সম্ভব দেখাতে চেষ্টা করব।

তিনি এটাও বলেছিলেন, পাদপ্রদীপের তলায় তিনি কখনই নিজেকে একথা না বলে দাঁড়াতেন না : 'আমি আমার দর্শকদের ভালোবাসি, আমি আমার দর্শকদের ভালোবাসি। হাস্যকর বলে ভাবছেন? আপনার যেমন ইচ্ছে অবশ্য ভাবতে পারেন। আমি শুধু কথাগুলো আপনাদের কোনো মন্তব্য ছাড়াই শোনাচ্ছি যে কথাগুলো আমি শুনেছি বিশ্বের একজন সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ জাদুকরের কাছ থেকে।

মাদাম শূয়্যান-হিঙ্কও ঠিক এই কথাই আমাকে বলেন। খিদে আর ভগ্ন হৃদয়ে জ্বালা আর শোকাবহ জীবন কাটানোর ব্যর্থতায় সন্তানসহ একবার আত্মঘাতী হতে গিয়েছিলেন একেবারে তার চূড়ায়। আর শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সবার প্রিয় একজন গায়িকা। আর তিনিও স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁরও সাফল্যের চাবিকাঠি হল এই যে তিনি মানুষ সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী ছিলেন।

ঠিক এই রকমই ছিল থিয়োডোর রুজভেল্টের আশ্চর্যজনক জনপ্রিয়তার রহস্যের গোড়ার কথা। এমন কি তাঁর পরিচালকরাও তাকে ভালোবাসতো। তাঁর নিগ্রো পরিচালক জেমস্ ই, অ্যামোর্স তাঁর সম্পর্কে থিয়োডোর রুজভেল্ট হিরো টু হিজ ভ্যালে' নামে একখানা বই লিখেছিল। ওই বইটায় অ্যামোস একটা ঘটনার সুন্দর বিবরণ দিয়েছে :

'একবার আমার স্ত্রী প্রেসিডেন্টকে পাখি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে কোনোদিন কোয়েল পাখি দেখে নি, তাই প্রেসিডেন্ট তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেন। বেশ কিছুদিন পরে আমাদের কটেজের টেলিফোন বেজে উঠল [অ্যামোস আর তার স্ত্রী অয়েস্টার বের রুজভেল্ট এস্টেটে বাস করত]। আমার স্ত্রী টেলিফোনে সাড়া দিতেই স্বয়ং মি. রুজভেল্টের গলা শুনতে পেল। প্রেসিডেন্ট জানালেন তিনি ফোন করেছেন এটাই জানাবার জন্য যে তার জানালার সামনে একটা কোয়েল পাখি বসে আছে তিনি ইচ্ছে করলেই দেখতে পাবেন। এই রকম ছোটোখাটো ব্যাপার তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। যখনই তিনি আমাদের কটেজের পাশ দিয়ে যেতেন, আমরা তখন কাছাকাছি না থাকলেও তিনি ডাক ছাড়তেন, 'অ্যানি...জেমস্! যাওয়ার মুখে এটা ছিল তাঁর বন্ধুত্বের ডাক।

এমন একজন মানুষকে কর্মচারীরা না ভালোবেসে থাকে কেমন করে? তাছাড়া তাকে ভালো না বাসার কারণও ছিল না। রুজভেল্ট একবার হোয়াইট হাউসে আসেন। সে সময় প্রেসিডেন্ট ট্যাফট আর মিসেস ট্যাফট বাইরে ছিলেন। সাধারণ নিচের তলার মানুষদেরও যে তিনি কতটা ভালোবাসতেন সেটা বোঝা যায় এটা থেকেই যে তিনি হোয়াইট হাউসের সমস্ত পরিচারকদেরই নাম ধরে ডাকতেন, এমন কি রান্নাঘরের

পরিচারিকাকেও। এ বিষয়ে আর্টিবাট লিখেছেন : 'তিনি রান্নাঘরের পরিচারিকা অ্যালিসকে দেখতে পেয়ে বললেন যে তখনো ভুট্টার রুট বানায় কি না। অ্যালিস জানাল সে মাঝে মাঝে বানায় বটে চাকর-বাকরদের জন্য, তবে উপরতলার কেউ তা খায় না।

রুজভেল্ট উজ্জ্বল হয়ে বললেন : তাদের রুচিটাই বাজে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হলে বলব।'

'অ্যালিস প্লেটে করে তার জন্যে একটা রুটি নিয়ে এলে সেটা চিবোতে চিবোতে তিনি ফিসের দিকে চললেন। যাওয়ার সময় সমস্ত মালী আর মজুরদের শুভেচ্ছাও জানাতে চাইলেন...।

'তিনি অতীতে যে ভাবে সবাইকে ডাকতেন সেই ভাবেই তাদের ডাকলেন। তারা নিজেরা এখনো তাঁর কথা ফিসফিস করে আলোচনা করে। আইক হুভার সজল চোখে একবার বলেছিল : দু বছরের এটাই ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় দিন, আমাদের কেউই একশ ডলারের বদলেও এটা হাতছাড়া করতে চাইতাম না।'

অন্যান্য মানুষের সমস্যা সম্পর্কে এত গভীর ভাবনাই ড. চার্লস এলিয়টকে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সফল প্রেসিডেন্ট হবার মর্যাদা দিতে পেরেছে–আপনাদের হয়তো মনে আছে তিনিই গৃহযুদ্ধের শেষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়া অবধি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিলেন।

তার কাজের ধারার একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একদিন কলেজে প্রথম ভর্তি হওয়া নতুন ছাত্র এল. আর. জি. ক্র্যান্ডন প্রেসিডেন্টের অফিসে গিয়ে ছাত্রদের ঋণ ভাণ্ডার

থেকে পঞ্চাশ ডলার ধার নিতে যায়। ঋণ মঞ্জুর হল। তার নিজের ভাষাতেই এবার সব শুনুন। এরপর আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে আসতে চাইছিলাম–তখন প্রেসিডেন্ট এলিয়ট বললেন, 'দয়া করে একটু বসো। তারপর দারুণ অবাক হলাম তিনি যেই বললেন : আমি শুনলাম, তুমি নিজের ঘরে তোমার রান্না করে খাও। আমার মনে হয় কাজটা খুবই ভালো তোমার পক্ষে, বিশেষ করে ভালো আর যথেষ্ট খাবার যদি পাও। আমি যখন কলেজে পড়তাম তাই করতাম। তুমি কখনো মাংসের রুটি বানিয়েছ? জিনিসটা বানাতে পারলে খুবই ভালো, একটুও নষ্ট হয় না। আমি কীভাবে বানাতাম এবার শোন। তিনি এরপর আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কি করে মাংস কেটে ধীরে ধীরে রান্না করতে হয় যাতে সবটা শুকিয়ে না গিয়ে বেশ শুকনো হয়, তারপর রুটির মধ্যে নিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হয়।'

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি তাদের প্রতি আগ্রহী হলে আমেরিকার সবচেয়ে নামী লোকদের নজর, সময় আর সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

বেশ কয় বছর আগে আমি ব্রুকলীন ইনস্টিটিউট অব পার্টস্ অ্যান্ড সায়েন্সে গল্প লেখার পাঠক্রম পরিচালনা করেছিলাম। সেখানে আমরা ক্যাথলিন নরিন, ক্যালি হার্স, রিউপার্ট হিউনেন ইত্যাদি নামী আর ব্যস্ত লেখকদের ব্রুকলিনে এনে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিষয় জানাতে অনুরোধ করি। অতএব আমরা তাঁদের চিঠি লিখে বললাম আমরা লেখার প্রশংসা করি আর তাদের পরামর্শ পেতে আমরা খুবই আগ্রহী, আমরা আরো জানাতে চাই তাদের সাফল্যের রহস্যই বা কি?

প্রতিটা চিঠিতে সই করেছিল, অন্তত : দেড়শ জন ছাত্র-ছাত্রী। আমরা লিখেছিলাম যে আমরা জানি তারা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ-কোনো বক্তৃতা তৈরি করা তাদের পক্ষে বেশ কঠিন। আর তাই আমরা সঙ্গে পাঠালাম কিছু প্রশ্ন। যেগুলোর উত্তর পেলে আমরা তাদের কাজের ধারা বুঝতে পারব। তাদের এটা পছন্দ হল। কারো বা পছন্দ হয় না? অতএব তাঁরা তাঁদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ব্রুকলিনে এসে আমাদের সাহায্য করতে চাইলেন।

ঠিক একই রকম পদ্ধতিতে আমি জেসলি এম শ. থিয়োডোর রুজভেল্টের অর্থ সেক্রেটারিকে, স্ট্যাফেটের কেবিনেটের অ্যাটর্নি জেনারেল জর্জ ডব্লিউ উইকার্সহ্যামকে, ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে, আর আরো বহু বিখ্যাত মানুষকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে ছাত্রদের জনতার কাছে বক্তৃতার বিষয়ে বলাতে সক্ষম হই।

আমাদের সকলেই, কসাই, রুটিওয়ালা বা সিংহাসনে বসা রাজা নাই হই, আমাদের যারা প্রশংসা করেন তাদের পছন্দ করি। জার্মানির কাইজারের কথাটাই উদাহরণ হিসেবে ধরুন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনিই বোধহয় হয়ে পড়েন পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত আর বিতর্কিত একজন ব্যক্তি। এমন কি তাঁর নিজের দেশবাসীও তার বিরুদ্ধে চলে যায় আর তিনিও নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে হল্যান্ডে পালিয়ে যান। তার বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তাঁকে হাতে পেলে লোকে বোধ হয় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত বা আগুনে গলিয়ে ফেলত। এই রকম ক্রোধের আর ঘৃণার মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে কাইজারকে একখানা চিঠি লিখে তাতে তার আন্তরিকতা আর প্রশংসা জানিয়েছিল। ছোট ছেলেটি লিখেছিল অন্যরা যা বলে বলুক সে সব সময়েই উইলহেলমকে তাঁর সম্রাট হিসেবে ভালোবেসে যাবে। কাইজার চিঠিটা পেয়ে একেবারে

আন্তরিকভাবে গলে যান আর ছেলেটিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান, সে যেন এসে তার সঙ্গে দেখা করে। ছেলেটি এসেছিল আর সঙ্গে তার মাও এসেছিল–আর কাইজার পরে তাকে বিয়ে করেন। ছোট ছেলেটিকে বন্ধুলাভ ও প্রভাব বিস্তার' গোছের কোনো বই পড়তে হয় নি। ব্যাপারটা সে অন্তর থেকেই উপলব্ধি করেছিল।

আমরা যদি বন্ধুত্ব করতে চাই, তাহলে অন্যদের অন্য কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে–যে কাজ করতে চাই সময়, মানসিকতা, নিঃস্বার্থতা আর চিন্তাধারা। ডিউক অব উইন্ডসর যখন প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন তখন দক্ষিণ আমেরিকা সফরে যাওয়ার আগে তিনি স্পানীশ ভাষা শিখতে শুরু করেন যাতে সে দেশে গিয়ে তাদের ভাষাতেই কথা বলতে পারেন। দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ এজন্য তাঁকে খুবই ভালোবাসতো।

বহু বছর যাবৎ আমি এটা ঠিক করেছি আমার বন্ধু-বান্ধবদের জন্মদিনের তারিখটা মনে রাখতে হবে। কীভাবে? যদিও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার কণামাত্রও বিশ্বাস নেই তাহলেও আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি কারো জন্মদিনের তারিখের সঙ্গে সেই মানুষের চরিত্র আর ভাবভঙ্গির কোনো সম্পর্ক আছে কি না? তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর জন্ম মাস আর তারিখ কি? সে যদি বলে ২৪শে নভেম্বর, তাহলে আমি বারবার আউড়ে চলি–২৪শে নভেম্বর! ২৪ শে নভেম্বর! তারপর সে পিছনে ফিরলেই একটা কাগজে তার নাম আর জন্ম তারিখটা লিখে ফেলি। পরে সেটা জন্মদিনের একটা ডায়েরিতে লিখে রাখি। প্রত্যেক বছরের গোড়ায় ওইসব জন্ম তারিখ আমার ক্যালন্ডারে পর পর লিখে রাখি; ফলে সবই আমার সহজেই মনে থাকে। ঠিক তারিখটা হলেই তার কাছে আমার চিঠি বা টেলিগ্রাম পৌঁছে যায়। এর প্রতিক্রিয়া দারুণ হয়! কারণ পৃথিবীতে আমিই একমাত্র মানুষ হয়ে উঠি যার ব্যাপারটা মনে আছে।

আমরা যদি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাই তাহলে মানুষকে অত্যন্ত সজীব ভঙ্গিতে আর উৎসাহ দিয়ে অভ্যর্থনা করা শুরু করি আসুন। কেউ টেলিফোন করলেই এমনভাবে হ্যালো' বলুন যেন মনে হয় তার গলা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন আপনি। দি নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানি তাদের অপারেটরদের শেখানোর জন্য নানা ব্যবস্থা করে তাকে যাতে তারা কেউ ফোন করলেই এমনভাবে আপনার নম্বরটা বলুন' বলে যে মনে হয় সে সুপ্রভাত, আপনার সেবা করতে পেরে আনন্দিত' এটাই বোঝায়। কাল টেলিফোন করার সময় কথাটা মনে রাখবেন।

কাজেকর্মে এই দার্শনিক তত্ত্বটাইক কাজ দেবে? এর বেশ কিছু উদাহরণ আমি দিতে পারি তবে সময়ের অভাব মাত্র দুটো দিচ্ছি।

নিউইয়র্ক শহরের একটা বড় ব্যাংকের চার্লস আর ওয়াল্টার্সের উপর দায়িত্ব পড়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা গোপন রিপোর্ট তৈরি করার। তিনি জানতেন মাত্র একজন লোকেই তাঁর যেসব বিষয় জরুরি দরকার তা জানে। মি. ওয়াল্টার্স তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন–ভদ্রলোক বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট। মি. ওয়াল্টার্সকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে এক তরুণী দরকার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে প্রেসিডেন্টকে জানাল তার জন্য ওই দিন কোনো ডাকটিকিট নেই।

'আমার বাবা বছরের ছেলের জন্য ডাকটিকিট জোগাড় করছি', প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার্সকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

মি. ওয়াল্টার্স এবার তাঁর কাজের কথায় এলে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। প্রেসিডেন্ট কিন্তু বেশ ছাড়াছাড়া ভাব দেখাতে চাইছিলেন, তিনি দু'চারটে কথাই শুধু বললেন। কথা বলার উৎসাহই তার ছিল না, কোনোভাবেই তাকে দিয়ে বলানোও গেল না। সাক্ষাৎকার পর্ব ওখানেই শেষ হল।

'খোলাখুলি বলছি, মি. ওয়াল্টার্স ক্লাসে তার কাহিনী বলতে গিয়ে জানালেন, 'কি করা দরকার বুঝতে পারি নি। তারপরেই আমার মনে পড়ে গেল তার সেক্রেটারি কি বলেছিল–ডাকটিকিট, বার বছরের ছেলে... তখনই আমার মনে পড়ে গেল আমাদের বিদেশ দপ্তর ডাকটিকিট জমায়–সাত সমুদ্র পার হয়ে আসা বিভিন্ন মহাদেশের যত ডাকটিকিট।

'পরদিন বিকেলে আমি আবার ভদ্রলোকর কাছে হাজির হলাম আর খবর পাঠালাম যে, তার ছেলের জন্য কিছু ডাকটিকিট এনেছি। আমাকে খাতির করে ভিতরে ডাকা হয়েছিল কি? হ্যাঁ, স্যার তাই হয়েছিল। তিনি আমার সঙ্গে এত জোরে করমর্দন করেন যেন কংগ্রেসের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। আনন্দে উচ্ছল হয়ে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক। আমার জর্জের এগুলো খুবই পছন্দ হবে', ডাকটিকিটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বললেন এটা একবার দেখুন। সত্যিই দারুণ?

'এরপর আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ডাকটিকিট নিয়ে আলোচনা করে আর তার ছেলে ছবি দেখে কাটালাম। তারপর তিনি একঘণ্টা ধরে আমি যে খবর চাইছিলাম তাই দিতে লাগলেন। সব খবরই তাঁর কাছ থেকে এসে গেল। আমাকে কোনোরকম চেষ্টাই করতে হল না। তার যা যা জানা ছিল সবই তিনি জানালেন আমায়। আর তারপর তার অধীনস্থ

কর্মচারীদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের জানা প্রশ্ন করে খবর দিলেন। নিজের সহকর্মীদের টেলিফোনও করলেন। বলতে গেলে খবরের আর রিপোর্টের একটা বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিলেন। খবরের কাগজের লোকদের হিসেবে আমি একেবারে বাজিমাত করেছিলাম বলা যায়।

আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি :

ফিলাডেলফিয়ার সি. এম. ন্যাফলে জুনিয়ার প্রায় তিন বছর ধরে একটা মস্ত চেইনস্টোরকে কয়লা বিক্রি করার চেষ্টা চালান। কিন্তু ওই চেইন-স্টোর কোম্পানি শহরের বাইরের এক সরবরাহকারীর কাছ থেকেই কয়লা কিনে তা আবার মি. ন্যাফলের অফিসের দরজার সামনে দিয়েই নিয়ে আসত। এরপর একদিন মি. ন্যাফলে আমার ক্লাসে এসে ওই চেইন-স্টোরের বিরুদ্ধে তার গায়ের জ্বালা মিটিয়ে গাল দিলেন আর বললেন এরা হচ্ছে দেশের শত্রু ছাড়া কিছু না।

তিনি শুধু অবাক হয়ে ভাবতে চাইতেন তিনি ওদের কেন কয়লা বিক্রি করতে পারেন না।

আমি তাকে পরামর্শ দিলাম অন্য কৌশল কাজে লাগাতে। ছোট্ট করে বলল, যা ঘটেছিল সেটা এই রকম। আমরা এই বিতর্কসভায় আয়োজন করলাম-বিতর্কের বিষয় ঠিক হল : ‘চেইনস্টোর দেশের ভালো করার বদলে ক্ষতিই করে চলেছে।

ন্যাফেলে আমার পরামর্শে অন্য দিকেই নিলেন, তিনি চেইন স্টোরের হয়েই বক্তব্য রাখতে রাজি হলেন। তারপর সোজা হাজর হলেন যাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করেন সেই

চেইনস্টোরের একজন কর্মকর্তার আছে। তাকে তিনি বললেন : আমি এখানে কয়লা বিক্রি করতে আসি নি আমি শুধু আপনার কাছে একটা সাহায্যের জন্য এসেছি। তিনি এরপর ওই বিতর্ক প্রতিযোগিতার কথাটা জানিয়ে বললেন : আমি আপনার কাছে সাহায্য চাএত এসেছি এই কারণেই যে আমি জানি যে খবর চাই সেটা আপনারা ছাড়া কেউই দিতে পারবে না। প্রতিযোগিতাটা আমি যেমন ভাবেই হোক জিততে চাই, তাই যে সাহায্য দেবেন আপনি, তাতে কৃতজ্ঞ থাকব।'

এর পরের ঘটনা মি. ন্যাফেলের নিজের কথাতেই শুনুন :

'আমি ভদ্রলোকের কাছে ঠিক এক মিনিট সময় দিতে অনুরোধ জানাই। এই শর্তেই তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে রাজি হন। আমার প্রয়োজনের ব্যাপারটা তাঁকে জানানোর পর আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে তিনি আমার জন্য খরচ করেছিলেন ঠিক একঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিট। এরপর তিনি আর একজন কর্মকর্তাকে ডাকলেন, তিনি চেইনস্টোর নিয়ে একখানা বই লিখেছিলেন। তিনি যাবতীয় চেইনস্টোর সংস্থার কাছে চিঠি লিখে ওই বিষয়ে বিতর্ক সম্পর্কে একখানা বই আমাকে আনিয়ে দেন। তাঁর মতো হল এই চেইনস্টোর মানব সমাজের সেবা করে চছে। তিনি খুবই গর্বিত, সমাজের নানা স্তরের জন্য যা করে চলেছেন। কথা বলার ফাঁকে তাঁর মুখচোখ উজ্বল হয়ে উঠছিল। আর আমি স্বীকার করছি তিনি নানা অজানা বিষয়ে আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন–এসব আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তিনি আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে দেন।

আমি যখন চলে আসছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলেন, তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বিতর্কে আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। পরে একসময় আবার দেখা করে আমায় বিতর্কে কি রকম হল জানাতেও অনুরোধ জানালেন। শেষ যে কথা তিনি আমায় বললেন তা হল : বসন্ত কালের শেষে আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার কাছ থেকে কিছু কয়লা কিনব।'

আমার কাছে ব্যাপারটা একেবারে অলৌকিক। তিনি আমার কাছ থেকে কোনো রকম প্রস্তাব ছাড়াই কয়লা কিনতে চাইছেন। আর তাঁর সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যেই আমি অনেকটা অগ্রসর হয়েছি যা আমি আমার কয়লার প্রতি আগ্রহী করতে দশ বছর চেষ্টা করেও করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

আপনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নি, মি. ন্যাফলে, কারণ বহু বছর আগে যীশুর জন্মেরও একশ বছর আগে বিখ্যাত এক রোমান কবি পাবলিয়ান সাইরাস মন্তব্য করেছিলেন : 'আমরা অন্যের প্রতি তখনই আগ্রহী হই, অন্যেরা যখন আমাদের প্রতি আগ্রহী হয়।'

অতএব আপনি যদি চান লোকে আপনাকে পছন্দ করুক, তাহলে তার সবার সেরা নীতি হল এই রকম"

'অন্যের প্রতি সত্যিকারভাবে আগ্রহী হয়ে উঠুন।'

১২. লোকের মন জয় করবার রহস্য

আমি সম্প্রতি নিউইয়র্কে এক নৈশভোজের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন যিনি ইদানীং প্রচুর অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেকের মধ্যেই বেশ একটা সুখকর ছাপ ফেলার চেষ্টা করছিলেন। তিনি হীরে জহরত মণি মাণিক্যের মালা পরেছিলেন অথচ মুখের কোনো পরিচর্যা করেন নি। সে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল শুধু তিক্ততা আর স্বার্থপরতা। তিনি এটা বোঝেন নি যে প্রতিটি পুরুষ কি জানেন, অর্থাৎ, কোনো মহিলার মুখে যে ভাব থাকে, সেটা তার জাঁকজমকপূর্ণ দেহের পোশাকের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

চার্লস্ শোয়াব একবার আমাকে বলেন, তাঁর হাসর দাম দশ লক্ষ ডলারেরও বেশি। কথাটা তিনি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। কারণ শোয়াবের ব্যক্তিত্ব, তার আকর্ষণ, মানুষকে চট করে ভালো লাগানোর ক্ষমতাগুলোই তার অস্বাভাবিক উন্নতির মূল ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্যের মধ্যে ছিল তাঁর বিজয়ী হাসি।

একবার আমি মরিস শেভালিয়েরের সঙ্গে সারা বিকেলটা কাটাই–আর সত্যি বলতে কি আমি সম্পূর্ণ তাশ হই। গম্ভীর, অন্ধকার মুখ ভদ্রলোককে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে আলাদাই লেগেছিল–যতক্ষণ না তিনি হাসলেন। তখনই মনে হল যেন মেঘের মধ্য দিয়ে একফালি সোনাঝরা রোদের হাসি। তার ওই হাসি না থাকলে মরিস শেভালিয়ের বোধ হয় প্যারীতে তার বাবা বা ভাইদে মতোই কাঠের আসবাবপত্র বানানোর কাজেই থেকে যেতেন।

কোনো কথার চেয়ে কাজের মধ্য দিয়েই মনের ভাব বেশি প্রকাশ পায় আর কোনো হাসির মধ্যে জেগে ওঠে এই কথাটাই আমি আপনাকে পছন্দ করি। আপনাকে দেখে খুব খুশি আর আনন্দিত হলাম।

এই জন্যই কুকুরদের এত দাম। আমাদের দেখে তাদের খুশি সত্যই বাঁধ মানে না। আর স্বাভাবিকভাবেই আমরাও তাই হই।

কিন্তু কৃত্রিম কোনো হাসি? না, তাকে কোনো লোককে ঠকানো যায় না। আমরা বুঝতে পারি সেটা যান্ত্রিক আর তাই সেটা আমরা পছন্দ করি না। আমি যে হাসির কথা বলছি সেটা হল সত্যিকার হৃদয় থেকে আনা হাসি। যে হাসি আসে অন্তর থেকে, এরকম কোনো হাসিই ভুবন জয় করতে পারে।

নিউইয়র্কের বিরাট এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের নিয়োজন অধিকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে, বিক্রয়কারিণী মেয়ে হিসেবে স্কুলের বেড়া পেরোয়নি এমন কোনো মেয়েকেও তিনি চাকরি দিতে প্রস্তুত যদি তার চমৎকার হাসি থাক, বদলে তিনি দর্শনশাস্ত্রের কোনো গম্ভীর পণ্ডিতকে চাইবেন না।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় রবার প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান একবা আমাকে বলেছিলেন, যে তার মতে কোনো লোক তার কাজে আনন্দ না পেলে কখনো সাফল্য লাভ করেন না। এই শিল্পপতি ভদ্রলোক বলেছিলেন, প্রাচীন সেই তত্ত্ব কথায় তাঁর বিশ্বাস নেই যে কঠিন পরিশ্রম করলেই সব কাজে অনায়াসে সফল হওয়া যায়। তিনি বলেন : আমি এমন সব মানুষকে জানি যারা সাফল্য লাভ করেন যেহেতু তাদের

কাজে তারা প্রভূত আনন্দ পেতেন। আবার অন্যদের দেখেছি তারা কাজ করতে শুরু করার পর সেটা একঘেয়ে হয়ে ওঠায় তাঁরা ব্যর্থ হলেন।

আপনি যদি চান অন্যেরা আপনাকে দেখে আনন্দিত হোক তাহলে অন্যদের দেখে আপনিও আনন্দ প্রকাশ করুন।

আমি হাজার হাজার ব্যবসায়ীকে বলেছি প্রতিদিন এক সপ্তাহ ধরে যাঁর সঙ্গেই দেখা হবে তাদের দেখে হাসতে। তারপর আমার ক্লাসে এসে জানাতে ফল কেমন হল। এতে কি কাজ হয়েছিল? দেখা যাক...এই যে নিউইয়র্ক কার্ব এক্সচেঞ্জর মি. উইলিয়াম বি. স্টাইনহার্টের লেখা একখানা চিঠি। তাঁর চিঠি কোনো ব্যতিক্রম নয় বরং এরকম আরো শয়ে শয়েই আছে।

'আমার বিয়ে হয়েছে প্রায় আঠারো বছর', মি. স্টাইনহার্ট লিখেছিলেন, আর ওই সময়ে আমি কদাচিত স্ত্রীকে দেখে হেসেছি বা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে খুব বেশি কথা বলেছি। ব্রডওয়েতে আমি ছিলাম সবচেয়ে অসুখী মানুষ।

'আপনি যখন বললেন আমার হাসি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা জানাতে তখন ঠিক করলাম এক সপ্তাহ ধরে সে চেষ্টা করব। আর তাই পরের দিন সকালে আয়নায় চুল আঁচড়ানোর সময় যখন আমার পেঁচার মতো মুখখানা দেখলাম তখনই নিজেকে বলে উঠলাম, বিল, তোমার মুখ থেকে ওই অন্ধকারটা দূর করতে হবে। তোমায় এবার হাসতে হবে। আর সেটা এখন থেকেই শুরু করা চাই' প্রাতরাশের সময় আমি আমার স্ত্রীকে হেসে বললাম : সুপ্রভাত, প্রিয়া। ঠিকই যেমন ভেবেছিলাম।

‘আপনি আমাকে সাবধান করেছিলেন ও অবাক হতে পারে। আসলে, আপনি ওর প্রতিক্রিয়াটা কম করেই বলেছিলেন। সে বেশ ধাঁধায় পড়ে যায়। সে বেশ ধাক্কাও খায়। আমি স্ত্রীকে বললাম ভবিষ্যতে এমন কিছুই যে রোজ আশা করতে পারে। আর তাই দু মাস ধরে প্রত্যেক সকালে এই রকমই করে যাই।

‘আমার এই পরিবর্তিত মানসিক ভঙ্গি গত এক বছরে যা হয় নি সেই সুখ দু মাসে এনে দিয়েছে।

‘কোন অফিসে যাওয়ার সময় আমি বাড়ির নিকট বয়কে অভিনন্দন জানাই সুপ্রভাত’ বলে, সঙ্গে থাকে হাসি। দারোয়ানকে দেখেও তাকে হাসি দিয়ে অভিনন্দন জানাই। সাবওয়ের ক্যাসিয়ারকেও খুচরো নেবার সময় অভিনন্দন জানাই। অফিসের দরজায় দাঁড়ানোর সময়েও যাদের কখনো দেখি নি তাদেরও হাসিতে অভ্যর্থনা জানাই।’

‘আচমকাই আবিষ্কার করলাম সকলেই আমাকেও হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করছে। যারা আমার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে আমি হাসিমুখেই তাদের কথা শুনি। হামিমুখেই তাদের বক্তব্য শুনি তাকে আমার ধারণা হয়েছে অভিযোগেই ব্যাপারটাও সহজে মিটে যায়। আমি দেখছি এই হাসিই আমাকে প্রত্যেকদিন অনেক বেশি টাকা এনে দিচ্ছে।

আর একজন ব্রোকারের সঙ্গেই আমার অফিস চালাই আমি। তার একজন কেরানি ভারি চমৎকার একটি তরুণ, আমার ওই হাসির ফলাফলে আমার এমনিই আনন্দ হয়েছিল যে তাকে একদিন আমার নতুন মানবিক জীবন দর্শনের কথা বলে ফেললাম। সে তখন

স্বীকার করল সে যখন এই অফিসে প্রথম আসে তখন আমাকে সাঙ্ঘাতিক রকম অসুখী বলে ভাবতইদানিং কালে তার গেছে। সে জানিয়েছে আমি হাসলে সত্যিই ভালো লাগে।

'আমার কাজের পদ্ধতিতে সমালোচনা করাও বন্ধ করেছি। দোষারোপের বদলে আমি এখন শুধু প্রশংসাই করতে থাকি। আমি কি চাই সে কথা বলা একদম ত্যাগ করেছি। এখন শুধু আমি চেষ্টা করি অন্য লোকদের দৃষ্টিতে সবকিছু যাচাই করতে। আর এগুলোই বলতে গেলে আমার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়েছে। আমি এখন সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষ-একজন অর্থবান, বন্ধুত্বেও সমৃদ্ধ, সুখী মানুষ-এর চেয়ে জীবনে আর কিসের দাম?

ব্যাপারটা মনে রাখবেন–মনে রাখবেন এ চিঠি এমন একজন লেখেন যার কাজ শেয়ার কেনাবেচা-যে ব্যবসাটা অতি কঠিন, শতকরা ৯৯ জনই যে কাজে ব্যর্থ হন।

আপনার হাসবার মতো মনের অবস্থা নেই? তাহলে আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে। প্রথমে জোর করে হাসার চেষ্টা করুন। যদি একলা থাকেন তাহলে জোর করে এক কলি গান গাইবার চেষ্টা করুন বা শিস দিন। ভাবতে চেষ্টা করুন আপনি সুখী, আর তাতেই আপনি সুখী হবেন। হার্ভার্ডের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ কথাটা এইভাবে বলেছিলেন :

'কাজকে মনে হয় অনুভূতি অনুসরণ করে থাকে। তবে আসলে কাজ আর অনুভূতি এক সঙ্গেই চলে। তাই কাজের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কারণ সেটা মনের এক্তিয়ার থাকে, আর তাতেই পরোক্ষে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যা ইচ্ছার বশবর্তী নয়।

তাই সুখী হওয়ার একমাত্র পথ হল, যদি সুখ না থাকে, আনন্দিত হয়ে সেইভাবেই কথাবার্তা বলা, যেন আপনি সত্যই সুখী...।'

পৃথিবীতে প্রত্যেকেই সুখ অনুসন্ধান করে চলেছে–আর সেটা লাভ করার একটাই মাত্র পথ আছে। আর সেটা হল আপনার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুখ কখনই বাইরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। সেটা নির্ভর করে এ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবেন তার উপর। একটা উদাহরণ দিচ্ছি–দুজন লোক একসঙ্গে, একই জায়গায় একই কাজ করতে পারে, দুজনেই একই টাকা আর সম্মানও পেতে পারে–তা সত্ত্বেও একজন দুঃখী আর অন্যজন সুখী হতে পারে। কেন? এর কারণ বিভিন্ন রকম মানসিক অবস্থা। চীন দেশে কুলিদের ঘর্মাক্ত কলেবরে প্রচণ্ড রোদে দৈনিক সাত সেন্ট আয় করতে যেমন হাসিমুখে কাজ করতে দেখেছি তেমনই দেকেছি এখানকার পার্ক অ্যাভিনিউতে।

'কোনোকিছুই ভালো বা খারাপ নয়', শেক্সপীয়ার বলেছেন? চিন্তাই এটা তৈরি করে।

লিঙ্কন একবার বলেছিলেন : কোনো লোক যতখানি সুখী হতে চায় ততটাই সুখী হতে পারে। তিনি –ঠিকই বলেছিলেন। এর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ আমি সম্প্রতি দেখেছি। আমি একদিন নিউইয়র্কের লঙ আইল্যান্ড স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম। ঠিক আমার সামনেই ত্রিশ বা চল্লিশ জন প্রতিবন্ধী খঞ্জ লাঠি আর ক্রাচে ভর রেখে সিঁড়ি বেড়ে উঠছিল। একটি ছেলেকে প্রায় কোলে করেই তুলতে হয়। ওদের হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গি লক্ষ্য করে আমি অবাক হয়ে যাই। ছেলেদের সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে যে লোকটি ছিল তাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, হ্যাঁ, ব্যাপারটা হল কোনো ছেলে যখন জানতে পারে সে জন্মের মতোই খোঁড়া হয়ে গেছে, তখন প্রথমে সে একটু আঘাত পেলেও সেটা পরে

কাটিয়ে ওঠে, তারপর ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে অন্যান্য সাধারণ ছেলের মতোই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ওই ছেলেদের আমার অভিনন্দন জানাই। ওদের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছিলাম তা কোনোদিনই ভুলব না।

মেরি পিকফোর্ড যখন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চলেছিলেন তখন তার সঙ্গে আমি একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম। পৃথিবীর সবাই তখন বোধহয় ভেবে নেয় মেরি পিকফোর্ড অত্যন্ত বিরক্ত আর অসুখী। কিন্তু আমি দেখলাম তিনি বেশ শান্ত স্বভাবের বেশ বিজয়িনী কোনো মহিলা, এমন কাউকে আমি দেখি নি। তার মুখ থেকে সুখ ফেটে পড়ছিল। তার গোপন রহস্যটা কি? ব্যাপারটা তিনি প্রকাশ করেছেন পঁয়ত্রিশ পাতার একটা ছোট্ট বইতে পড়ে দেখলে আনন্দ পাবেন। বইটার নাম 'হোয়াই নট ট্রাই গড?'

সেন্টলুইয়ের কার্ডিনালের ফ্রাঙ্কলিন বেটগার হলেন আমেরিকার অতি দক্ষ এক বীমাকারী পুরুষ। বেশ ক'বছর আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যার মুখে সদাই হাসি লেগে থাকে তিনি সব সময়েই স্বাগতম। অতএব কোনো লোকের অফিস কামরায় ঢোকার আগে তিনি একটু থেকে মনে মনে ভেবে নেন কি কি জিনিসের জন্য নিজেকে তিনি ধন্যবাদ জানাতে পারেন। তারপর মুখে একজন সৎ মানুষের হাসি ফুটিয়ে তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করেন।

এই সামান্য কৌশলেই তিনি বীমা করানোর কাজে এমন সাফল্য অর্জন করেছেন বলেই ভাবেন।

এলবার্ট হাভার্ডের এই সুন্দর উপদেশটার কথাটা একটু পর্যালোচনা করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন শুধু পর্যালোচনায় কাজ হবে না যতক্ষণ না কাজে লাগাচ্ছেন এটা :

যখনই বাড়ির বাইরে যাবেন, মাথাটা উঁচু রেখে ফুসফুঁসে বেশ হাওয়া ভরে নিন, বেশ কিছুটা সূর্যকিরণ গায়ে মেখে নিন। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই হেসে অভ্যর্থনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকভাবে করমর্দন করুন। ভুল বোঝার কথা মোটেও ভাবনে না আর নিজের নিজের শত্রুদের কথা ভেবে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করবেন না। কি করতে চলেছেন ভেবে মনটাকে দৃঢ় করে তুলুন, আর তারপর কোনোকিছু না ভেবেই ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যান। যে সব দারুণ কাজ করতে মনস্থ করেছেন সেই কথাটাই ভাবতে থাকুন–দেখবেন যে, দিন এগিয়ে চললেই আপনি অবচেতন ভাবেই আপনার ইচ্ছা পূরণ করার দিকে এগিয়ে চলেছেন আর সুযোগও পাচ্ছেন, ঠিক যেমন ভাবে প্রবাল, সাগরের ঢেউ থেকে তার দারকারি জিনিসটুকু সংগ্রহ করে নেয়। আপনার মনে আপনার যে সামর্থ, আন্তরিক আর দরকারি ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে চান তাই শুধু ভাবতে থাকুন। দেখবেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আপনি নিজেকে যেমন কল্পনা করেছেন সেই রকম ব্যক্তিত্ব সম্পন্নই আপনি হয়ে উঠছেন...চিন্তাই হল আসল। সর্বদাই যোগ্য একটা মন তৈরির চেষ্টা করুন-সাহস, সারল্য আর আনন্দময় একটা ভাব। ঠিক ভাবনার পরিণতিতেই আসে সৃষ্টি দক্ষতা। সব জিনিসই আসে ইচ্ছা থেকে আর প্রতিটি আন্তরিক প্রার্থনাই সফল হয়।

প্রাচীন চীনারা খুবই জ্ঞানী মানুষ ছিল–পৃথিবীর নানা ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিল অসীম। তাদের একটা প্রবাদ নিয়ে আমাদের উচিত সেটা আমাদের টুপির নিচে সেঁটে রাখা।

সেটা হল এই রকম : যে মানুষের মুখে হাসি নেই, তার কোনো দোকান খোলা উচিত নয়।

আর দোকানের কথা বলতে গেলে ফ্রাঙ্ক আর্ভিন ফ্লেচারের বিজ্ঞাপনটার কথা মনে রাখা দরকার। তিনি দিয়েছেন এই ঘরোয়া দার্শনিক তত্ত্ব :

খুশির দিনের হাসির মূল্য—

এতে খরচ নেই, তবে সৃষ্টি করে অনেক কিছু।

এতে যারা গ্রহীতা তাদের প্রচুর লাভ হয়, অথচ যারা দেয় তাদের কোনো ক্ষতি হয় না।

এটা ঘটে যায় চোখেল নিমিষে কিন্তু তার স্মৃতি থেক যায় বহুদিন।

কেউ এমন বড় মানুষ নন যার এটি ছাড়াই চলে যায়, আর এমন কেউ দরিদ্রও নেই যার এতে লাভ হয় না।

এতে গৃহে সুখ আসে, ব্যবসায়ে আসে সুনাম, আর হাসি হল বন্ধুত্বের চিহ্ন।

ক্লান্ত মানুষের কাছে হাসি হল বিশ্রাম, হতাশের কাছে আশার আলো, দুঃখিতের কাছে সূর্যের আলো, আর কষ্ট দূর করার ওষুধ।

তা সত্ত্বেও এটা কেনা যায় না, ভিক্ষা করে আনা যায় না, ধার করতে বা চুরি করতেও পারা যায় –কারণ হাসি যতক্ষণ না কাউকে দেয়া যায় ততক্ষণ তার কোনো জাগতিক মূল্য নেই।

আর বড়দিনের শেষ মুহূর্তের কেনাকাটার ভিড়ে দোকানের কর্মীরা যদি শ্রান্তিতে আমাদের তা না দিতে পারে আপনারা কি তাদের এই হাসির এক কণা দিয়ে আসতে পারেন না।

কারণ হাসি তাদের বেশি চাই যাদের দেবার মতো আর নেই।

অতএব যদি চান লোকে আপনাকে পছন্দ করুক তাহলে দু নম্বর নীতি হল; হাসুন!

১৩. মন জয় করবার সহজ উপায়

থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন হোয়াইট হাউসে ছিলেন, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি যদি শতকরা ৭৫ ভাগ ঠিক হতেন তাহলে আশাতীত কিছু করতে পেরেছেন বলেই ভাবতেন। বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের মানুষের কাছে যদি এটাই সব সেরা মাপ হয়, তাহলে আমি বা আপনি কি পারব আশা রাখি?

আপনি যদি একশবারের মধ্যে ৫৫ বার ভুল না হয়ে ঠিক হতে পারেন তাহলে আপনি ওয়ালস্ট্রিটে গিয়ে রোজ রোজ দশ লক্ষ, ডলারই আয় করতে পারেন, তার সঙ্গে একখানা প্রমোদতরী কিনে মস্ত গায়িকা কোনো মেয়েকে বিয়েও করতে পারেন। আর ৫৫ বার ঠিক হওয়া সম্বন্ধে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে অন্য লোকেরা ভুল করেছে কথাটা বলা আপনার সাজে কি?

কোনো মানুষের গলার স্বর, এমনকি অঙ্গভঙ্গি দেখেও আপনি বলতে পারবেন সে ভুল করছে কিনা–ব্যাপারটা আপনি আপনার দৃষ্টি দিয়েই বুঝিয়ে দিতে পারেন কিছু বলর দরকার হবে না। তাকে যদি তার ভুল ধরিয়েও দেন তাহলে কি চাইবেন সে আপনার মতো মেনে নিক? কখনই না কারণ এ কাজের মধ্য দিয়ে আপনি তাকে সরাসরি তার বুদ্ধি, বিবেচনা, তার অহমিকা আর আত্মসম্মানের উপর আঘাত করেছেন। এতে সে চাইবে আপনাকে প্রত্যাখাত করতে। অথচ এর জন্য সে কিছুতেই নিজের মতো পাল্টাবে না? এরপর আপনি তাকে প্লেটো, ইমানুয়েল কান্ট বা আর যারই হোক দর্শন প্রয়োগ

করতে পারেন, কিন্তু তাতে মতো বদলাবে না। যেহেতু আপনি তার অনুভূতিতে আঘাত করে বসেছেন।

কখনই এই ভাবে শুরু করতে চাইবেন না, এ ব্যাপারটা আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি, আসুন।'এটা অত্যন্ত খারাপ। এটা অনেকটা এই রকম বলাই হয় : দেখুন, আমি আপনার চেয়ে চালাকচতুর। আমি আপনাকে কিছু জ্ঞান দিয়ে আপনার মতো পাল্টানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এটা কিছুটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার মতো। এতে বিরোধিতা জাগিয়ে তোলা ঞয়, আপনার শ্রোতা আপনি কিছু শুরু করার আগেই আপনার সঙ্গে লড়াইতে নামতে চায়।

মানুষের মন বদলানো বেশ কঠিন কাজ। অতএব তাকে আরো কঠিন করে তুলে লাভ কি? নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনই বা কেন?

আপনি যদি কোনোকিছু প্রমাণ করতে চান তাহলে কাউকে সেটা জানতে দেবেন না। এ কাজ এমন গোপনে, কৌশলে করতে হবে যে কেউ যেন বুঝতে না পারে আপনি সেটা করে চলেছেন।

নিচের এই উদ্ধৃতিটা লক্ষ্য করুন :

মানুষকে এমনভাবে শেখাতে চান সে যেন না বোঝে আপনি তাকে শেখাতে চাইছেন লড চেস্টারফিল্ড তার ছেলেকে বলেছিলেন :

‘অন্য কারো চেয়ে যদি পারো জ্ঞানী হও, তবে সে কথা তাকে বল না।‘

বিশ বছর আগে আমি যা বিশ্বাস করতাম–একমাত্র অঙ্ক ছাড়া আর বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করি না–তাছাড়া যখন আইনস্টাইনের লেখা পড়ি তখন তাও আবার বিশ্বাস হয় না। আরো বিশ বছর পরে আমি এ বইটায় যা বলেছি সেটাও হয়তো বিশ্বাস করবেন না। আগে যে সব বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম এখন সে সম্বন্ধে ততটা নিশ্চিত আমি নই। সক্রেটিস এথেন্সে তাঁর শিষ্যদের বারবার বলতেন : আমিএকটা ব্যাপারই জানি, আর সেটা হল আমি কিছুই জানি না। যাই হোক আমি সক্রেটিসের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলে নিজেকে ভাবি না, আর তাই কাউকে বলতে চাই না, সে ভুল করছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি তাতে আখেরে কাজ হয়।

কোনো মানুষ কোনো কথা বললে সেটা যদি আপনার ভুল বলে মনে হয়–হ্যাঁ, প্রকৃতই ভুল কিন্তু-তাহলে এভাবেই শুরু করলে ভালো হয় না কি : ‘হ্যাঁ, এবর শুনুন! আমার অন্যরকম মনে হয়েছিল। তবে আমারো ভুল হতে পারে। কারণ আমার প্রায়ই ভুল হয়। আর আমার ভুল হলেই সে ভুলটা শুধরে নিতে চাই। তাহলে আপনার ব্যাপারটা একটু দেখা যাক, কি বলেন?

এই ধরনের কথায়, অর্থাৎ ‘আমারও ভুল হতে পারে। আমার প্রায়ই ভুল হয় ব্যাপারটা একটু দেখা যাক কি বলেন? সত্যিকার দারুণ জাদু থাকে, এই সব কথায়।

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল কোনো জায়গাতেই মানুষ আপনার ওই ধরনের কথায় কোনো প্রতিবাদ করতে চাইবে না।

ঠিক এই রকমই করে থাকেন একজন বিজ্ঞানী। আমি একবার বিখ্যাত আবিষ্কারক আর বিজ্ঞানী স্টেফানসনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি প্রায় এগারো বছর কাটিয়েছিলেন মেরু অঞ্চলে, তাছাড়াও তিনি ছ'বছর কেবলমাত্র মাংস আর পানি ছাড়া কিছুই খান নি। তিনি আমাকে তাঁর করা একটা পরীক্ষার বিষয় বলেছিলেন। আর আমি তাঁকে প্রশ্ন করি তিনি ওই পরীক্ষায় কি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আমি কোনোদিনই তাঁর উত্তরটা ভুলতে পারব না। তিনি বলেন : কোনো বিজ্ঞানী কখনো কিছু প্রমাণ করতে চান না। তিনি কেবল আসল ব্যাপার খুঁজে বের করার চেষ্টাই করে থাকেন।

আপনিও আপনার চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক পন্থা কাজে লাগাতে চান, তাই না? বেশ, এ ব্যাপারে আপনি

যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করতে না পারেন তাহলে কিন্তু দোষ আপনারই।

আপনার যে ভুলও হতে পারে এ কথাটা স্বীকার করলে আপনি কখনই কোনো ঝামেলায় পড়বেন না। এরকম করলে সব রকম তর্কের অবসান ঘটবে আর অপর ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে আপনি যেরকম পরিষ্কার আর উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন তাকেও সেই রকমই করে তোলে। এর ফলে সে যে, ভুল করতে পারে সেটাই স্বীকার করতে চাইবে।

আপনি যদি জানেন কোনো লোক ভুল করছে আর আপনি সে কথাটা তাকে মুখের উপরেই বলে ফেললেন, তাহলে কি হতে পারে? আসুন, আপনাদের একটা নির্দিষ্ট ঘটনার উদাহরণ দিই। মি. এস, নিউইয়র্কের একজন তরুণ অ্যাটর্নী, একবার আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে খুব গুরত্বপূর্ণ এক মামলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিষয়টাতে প্রচুর টাকা আর গুরুত্বপূর্ণ এক আইনের বিষয় জড়িত ছিল।

বিতর্ক চলার সময়, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি মি. এস-কে বিশেষ একটি আইনের দ্বারা ছ'বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এ কথাই বললেন।

মি. এস–একটু থমকে বিচারপতির দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখের উপর বলে বসলেন, হুজুর এরকম কোনো আইনই নেই।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে মি. এস–পরে লেখকের একটা ক্লাসে বলেছিলেন : 'আমার কথায় সারা কামরায় নিঃস্তব্ধতা নেমে এলো। মনে হচ্ছিল ঘরে তাপমাত্রা যেন শূন্য ডিগ্রিতেই নেমে গেছে; আমার কথাই ঠিক ছিল। বিচারপতি ভুল বলেছিলেন আর আমি সেই কথাটাই তাকে বলে ফেলি। এতে কি তিনি বন্ধুভাবাপন্ন। হন? না। আমি এখনো বিশ্বাস করি আইনটাট আমারই পক্ষে ছিল আর আমি এও জানতাম সেদিন যেভাবে বিতর্কে অংশ নিয়ে কথা বলি তেমন আর কোনোদিন পারি নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সে মামলায় জিততে পারি নি। আমি দারুণ একটা ভুল করেছিলাম। একজন শিক্ষিত আর জ্ঞানী বিচারপতির মুখের উপর তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে।

খুবই কম সংখ্যক লোকই যুক্তি মেনে চলে। আমাদের বেশিরভাগই একচোখা আর একপেশে মানুষ। আমাদের বেশিরভাগই আগে থেকেই একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকি–আর সেটা হয় ঈর্ষা, সনেদ্বীতি, হিংসা আর অহমিকাবোধ থাকার কারণে। আর বেশিরভাগ নাগরিকই কিছুতেই তাদের ধর্ম, চুলের ছাঁট, সমাজতন্ত্রবাদ বা ক্লার্ক গেবল

সম্বন্ধে ধারণা বদলাতে চান না। অতএব আপনি যদি চান মানুষকে তার ভুল সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন তাহলে নিচের অংশটা দয়া করে প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশের আগে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে চলুন। এটা প্রফেসর জেমস্ হার্ভে রবিনসনের আলোকিত একখানা বইয়েরই অংশ। বইটার নাম দি মাইন্ড ইন দা মেকিং'।

'আমরা মাঝে মাঝে কোনোরকম বাধা বা বড় করমের কোনো আবেগ ছাড়াই আমাদের মন বদলে ফেলি। কিন্তু আমাদের যদি বলা হয় আমরা ভুল করছি, তাহলে আমরা সেই কথায় বেশ আপত্তি প্রকাশ করি আর আমাদের হৃদয়ও বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠার ব্যাপারে অবিশ্বাস্য রকম অমনোযোগীই থাকি অথচ আমরাই আবার এর প্রতি দুরন্ত রকম আকর্ষণ দেখাই কেউ যদি সেটা কেড়ে নিতে চায়। আসলে এটা পরিষ্কার যে এই ধারণাগুলো কোনোভাবেই আমাদের একান্ত আপনার নয়, বরং সেটা হল আমাদের অহং ভাবটা যা বিপদের সামনে পড়ে যায়... আমার এই ছোট্ট কথাটা মানুষের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর এটা উপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে প্রাজ্ঞতার পথ। এটাতে একই রকম তীব্রতা থেকে যায় তা আপনি, আমার; আহার, 'আমার' কুকুর, আমার বাড়ি, আমার বাবা 'আমার দেশ, আমার সৃষ্টিকর্তা যাই বলুন না কেন। এছাড়াও আসল রহস্য হল পৃথিবীর জানা বিষয়ে আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস নিয়ে কেউ আপত্তি তুললেই আমরা রেগে যাই বা অসন্তোষ প্রকাশ করি...আমরা সেই সবই সত্যি বলে বিশ্বাস করে চলতে চাই চিরকাল আমরা যা সত্যি ভেবে এসেছি। আর এ বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহের প্রকাশ ঘটলেই আমরা যত রকমে পারি আমাদের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরতে চাই। এর ফলে হল আমাদের বেশিরভাগ তথাকথিত যুক্তিবোধের মধ্যে কেবল খুঁজে ফিরতে চাই আমাদেরই কথার প্রমাণ।

আমি একবার একজন ঘরসাজানোয় দক্ষ মানুষকে আমার বাড়ি সাজানোর দায়িত্ব দিই। যখন বিল পেলাম আমার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল।

কদিন পরে আমার একজন বন্ধু এসে সব দেখে গেলেন। কথায় কথা দামের কথা উঠতেই তিনি আঁৎকে উঠে বললেন : বলো কি? এ যে সাংঘাতিক। আমার মনে হচ্ছে লোকটা তোমাকে বেশ ঠকিয়েছে।

কথাটা সত্যি? হ্যাঁ, তা সত্যি; বন্ধু ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই কথাটা স্বীকার করতে চায় না যেটায় তাদের বুদ্ধি বিবেচনায় ধাক্কা লাগতে পারে। অতএব মানুষ বানাই আমি, নিজে যে ঠিক সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা চালালাম। আমি বললাম সবসেরা জিনিস সবচেয়ে সস্তায় মেলে না। আর কারো পক্ষেই ভালো জিনিস আর রুচিসম্মত কিছু ফুটপাতের মতো সস্তায় কখনো পাওয়া যাবে না, ইত্যাদি।

পরের দিন আর একজন বন্ধু এলেন। তিনি সব জিনিস দেশে বেশ প্রশংসা করতে লাগলেন। মনের খুশিতে টগবট করে তিনি বলেও ফেললেন এই রকম চমৎকার জিনিস তিনিও তার বাড়ির জন্য কিনবেন ভাবছেন। এবার কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়া হল অন্য রকম। আমি বললাম : মানে, সত্যি কথা বললে এসব খরচ আমার সাধ্যের বাইরে। বড্ড বেশি খরচ করেছি। এগুলো কিনে ভুলই করেছি।'

আমরা যখন ভুল করি, সেগুলো তো নিজেদের কাছে স্বীকার করতে পারি। আমাদের কাছে কৌশলে আর বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথাটা তুললে হয়তো অন্যের কাছে তা স্বীকারও করতে পারি, আর বুদ্ধি বিবেচনায় বললাম সবসেরা তো সস্তায় কখনে তা করে

আবার নিজেদের সারল্য আর মানসিক উদারহার জন্য অহমিকাও অনুভব করি। কিন্তু ব্যাপারটা আর তা থাকে না যদি কেউ জোর করে আমাদের এই তিক্ত পাঁচনটা যদি গেলাতে চেষ্টা করে...।

গৃহযুদ্ধের সময় আমেরিকার বিখ্যাত সম্পাদক হোরেস গ্রিল লিঙ্কনের নীতির প্রচণ্ড রকম বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঠাট্টা, তামাশা, আর তর্কের মধ্য দিয়েই তিনি লিঙ্কনকে তাঁর মতো মেনে নিতে বাধ্য করতে পারবেন। তিনি এই তিক্ত ধারণা আর প্রচার মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চালিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে যে রাতে বুথ লিঙ্কনকে গুলি করে সেদিনও তিনি প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনকে হিংস্রভাবে, ব্যঙ্গত্মক ব্যক্তিগত আক্রমণ করে লিখেছিলেন।

কিন্তু এই রকম তিক্ততার ফলে কি লিঙ্কন গ্রিলের সঙ্গে একমত হন? মোটেই না, হাস্যাস্পদ করে লাগনিন্দে করলে কখনই কাজ হয় না।

মানুষকে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে যদি চমৎকার কিছু উপদেশ চান, আর নিজেকে চালনা আর ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটাতে আগ্রহী হন তাহলে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী অবশ্যই পাঠ করবেন–এ আত্মজীবনী হল যত জীবনী আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আর আমেরিকার সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ রত্ন।

ফ্রাঙ্কলিন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন কীভাবে তিনি বিরক্তিকর তর্ক করার অভ্যাস ত্যাগ করেন আর নিজেকে কেমন করে আমেরিকার ইতিহাসে অতি ভদ্র, সক্ষম, আর কূটনীতিসম্পন্ন মানুষ করে গড়ে তোলেন।

একদিন, বেন ফ্রাঙ্কলিন যে সময় উড়নচণ্ডী যুবক, একজন বহুঁকালের বন্ধুসভার বন্ধু তাঁকে একপাশে টেনে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কড়া ভাষায় কতকগুলো গায়ে বেঁধে এমন সত্যি কথা শুনিয়ে দেন। কথাগুলো অনেকটা এই রকম :

'কেন, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তোমার মতে মত দেয় না এমন সব লোককে তুমি প্রায় চড় মারাতেই বাকি রাখো। তোমার মত এখন তাই আর কারো পছন্দ নয়। কেউ তা নিতে চায় না। তোমার বন্ধুরা এটা বেশ বুঝতে পেরেছে তুমি ওদের কাছাকাছি না থাকলেই তাদের সময় ভালো কাটে। তুমি এতে বেশি জান যে কেউ তোমাকে কিছু শেখাতে পারে না। বাস্তবিকই, কেউ আর সেরকম চেষ্টাও করবে না যেহেতু তাতে শুধু গণ্ডগোল আর অযথা খেটে মরতে হয়। অতএব, তুমি আর বেশি কিছু শিখতে পারছ না যেটুকু জান তার চেয়ে তো নয়ই। তাছাড়া যা তুমি জান তাও অতি সামান্য।'

বেন ফ্রাঙ্কলিন সম্পর্কে আমি যে চমৎকার জিনিসটা জানি তা হল তিনি কি সুন্দর ভাবেই না এই তিরস্কার গ্রহণ করেন। এটা বোঝার মতো তার যথেষ্টই বয়স হয়েছিল যে ব্যাপারটা সত্যিই, তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে এভাবে বলার অর্থ তিনি ব্যর্থ হবেন আর সামাজিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। তাই তিনি সময়মতই নিজেকে সংশোধন করে নিলেন। তারপর থেকেই তিনি তাঁর সেই উদ্ধত ধরন বদলে দিলেন।

'আমি নিয়ম করে ফেললাম', বেন ফ্রাঙ্কলিন লিখেছিলেন, অন্যের বিরক্তি ঘটিয়ে কোনোরকম সরাসরি তর্কে ছড়িয়ে পড়ব না আর নিজের মতামত জাহির করতেও চাইব না। তাছাড়াও আমি ঠিক করলাম কথাবার্তায় এমন কোনো কথা বলব না যাতে নিজের মতামত জানানো হয়। যেমন, নিশ্চয়ই 'নিঃসন্দেহে' ইত্যাদি। এর বদলে ঠিক করলাম

ব্যবহার করব 'আমার মনে হয়, আমার ধারণা', 'আমি ভাবছি এইসব। অন্য কেউ যদি কিছু বলে উঠতে চাইত আমি সরাসরি তাঁর কথায় বাধা না দিয় বা তার কথা অস্বীকার না করে বললাম তাঁর কথা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক হতেও পারে, তবে এ ব্যাপারে মনে হয় যেন সেটা অন্য কিছু হতে পারে, ইত্যাদি। আমি এরপর থেকেই এরকম কাজের তফাত বুঝতে পারলাম–আর বেশ সহজ ভাবেই সব ঘটে চলল। যেরকম বিনম্রতায় আমি আমার মতামত জানাতে শুরু করলাম তাতে কোনো বাধা না পেয়েই তা গৃহীত হতে লাগল। আমার ভুল হলেও কম স্তম্ভিত হতাম আর বেশ সহজেই অন্যেরা ভুল করলেও তাদের স্বমতে আনতে বেগ পেতে হত না।

এই রকম রীতিনীতি আমি এমন স্বাভাবিক ভাবেই আয়ত্ত করে ফেললাম যে সেটা বেশ সহজেই হয়ে এল যে গত পঞ্চাশ বছরেও কেউ কোনো ঝগড়া হতে পারে এমন কথা আমার মুখ থেকে শোনে নি। আর আমার এই অভ্যাসের জন্যই (আমার সততা নিয়েও) আমার মনে হয় আমি জনগণের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলাম যে পুরাতন বদল করে নতুন কিছু করতেও পারতাম। যদিও বক্তা হিসেবে আমি মোটেই ভালো ছিলাম না। নিজের কথা বা বক্তব্যও তেমন করে বোঝতেও পারতাম না তবুও আমি সাধারণভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলাম।

বেন ফ্রাঙ্কলিনের এমন কৌশল ব্যবসায় ক্ষেত্রে কেমন কাজে লাগে? দুটো উদাহরণ দেয়া যাক।

নিউইয়র্কের ১১৪ লিবার্টি স্ট্রিটের এফ, জে, ম্যাহনি তেল ব্যবসা সংক্রান্ত যন্ত্রাদি বিক্রি করে থাকেন। তিনি লং আইল্যান্ডের একজন বড় কক্কেলের জন্য কাজের বায়না

করেছিলেন। কাজটির জন্য একটা খসড়াও দেয়া ঞয় আর সেটা গৃহীত হলে কাজ রাও শুরু হয়। তারপরেই একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ঘটে যায়। ক্রেতা ভদ্রলোক তার বন্ধুদের সঙ্গে কাজটা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁর উপর ভুল কিছু জিনিস চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা নাকি ছোট, এটা নাকি সেরকম, এরকম এই সব তাঁকে তাঁরা বোঝায়। বন্ধুদের কথায় ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। তিনি মি. ম্যাহনিকে ফোন করে জানিয়ে দেন যে, যা বায়না দিয়েছেন তিনি সে জিনিস নিতে পারবেন না।

'আমি সব ব্যাপারটা সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে দেখতে পেলাম আমরাযা কছি সেটাই ঠিক।' মি. ম্যাহনি আমাকে জানিয়েছিলেন। তাছাড়াও আমি জানতাম ওঁর বন্ধুরা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বা বোঝেন না, তবে আমি বুঝলাম একথা তাঁকে বললে ফল মারাত্মক হবে। আমি লং আইল্যান্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার অফিসে ঢুকতেই ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠে দ্রুত কথা বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি এমন উত্তেজিত যে প্রায় ঘুসি পাকাতেও চাইছিলেন। তিনি আমাকে ঢের বকাবকি করে কথাটা শেষ করলেন এই বলে : বলুন এ ব্যাপারে কি করতে চাইছেন?"

আমি তাকে বেশ শান্তস্বরেই বললাম, "তিনি যা চাইবেন তাই করব। আপনি এর দাম দিচ্ছেন, অতএব পছন্দসই জিনিস চাইবার অধিকার আপনার আছে। তা যাই হোক কাউকে দায়িত্ব নিতে হবেই। আপনি যদি মনে করেন আপনিই ঠিক তাহলে আপনার ব্লুপ্রিন্ট দিন যদিও আমরা ইতিমধ্যে ২০০০ হাজার ডলার খরচ করেছি, তাহলেও কাজটা বাতিল করব। এ দুহাজার আমরা আপনাকে খুশি করার জন্যই ব্যয় করতে রাজি। তবে আপনাকে একটু সাবধান করে দিতে চাই আপনার কথা মতো জিনিস বানানো হলে সে

দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে, আর আমাদের পরিকল্পনা মতো কাজ করতে দিলে দায়িত্ব নেব আমরাই।'

ভদ্রলোক ততক্ষণে শান্ত হেয় এসেছিলেন। তিনি শেষপর্যন্ত বললেন, "ঠিক আছে, কাজ করে যান। তবে পছন্দ না হলে সৃষ্টিকর্তা আপনাদের সাহায্য করুন।

"ঠিকই হয়েছিল সবকিছু, ভদ্রলোক আমাদের আরো দুদফা কাজ এ বছরেই দেবেন কথা দিয়েছেন।

'ভদ্রলোক আমাকে যখন অপমান করেন আর ঘুসি উঁচিয়ে আসেন আর বলেন আমি আমার কাজ বুঝি না তখন আমার পক্ষে তর্ক না করে আত্মসম্বরণ করা কঠিনই ছিল। তবে সেটা করে, ভালোই করি, ওতে কাজও হয়। আমি যদি বলতাম তিনি ভুল করছেন তাহলে একটা তর্ক শুরু হত। হয়তো মামলাও হত, সৃষ্টি হত তিক্ততা, বহু টাকা খরচ হত, আমরা হারাতাম ভালো এক খরিদ্দার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, কেউ ভুল করছে না বলাই ভালো।

আর একটা উদাহরণ-মনে রাখবেন, যে সব কথা বলছি তার সবই হাজার হাজার মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতারই ফসল। আর ভি. ক্রাউলে নিউইয়র্কের বিরাট একটা কাঠের কোম্পানির সেলসম্যান। তাঁকে একজন দক্ষ কাঠ পরিদর্শকের সঙ্গে কাজ করতে হয়, তার ভুল হচ্ছে বলতেও হয়। তিনি নিজে তর্কেও জেতেন। তবে তাতে কোনো লাভ হয় নি। কারণ এই কাঠ পরিদর্শকরা, মি. ক্রাউলে বলেছেন,

অনেকটা বেসবল খেলার বিচারকের মতো। তারা কোনো ধারণা করলে তা আর বদলায় না।'

মি. ক্রাউলে দেখলেন তর্কে তিনি জিতলেও তাঁর প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এবার তিনি তাঁর কাজে কৌশল পাল্টাবেন ঠিক করলেন। আর তর্ক করবেন না। ফল কি হল? তাঁর নিজের মুখেই শুনুন :

এক সকালে আমার অফিসে টেলিফোন বেজে উঠল। ওপাশ থেকে শোনাও গেল বেশ উত্তেজিত, অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন, আমরা যে তার কারখানায় একগাড়ি কাঠ পাঠিয়েছি সেগুলো একদম বাজে। তাঁর প্রতিষ্ঠান ট্রাক থেকে সরিয়ে নিই।' ট্রাকের এক-চতুর্থাংশ নামানো হতে তাঁদের কাঠ

পরিদর্শক জানান যে কাঠের মান শতকরা ৫৫ ভাগনিচে। এ অবস্থায় তারা তা নিতে অস্বীকার করছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে রওয়ানা হলাম আর যেতে যেতে ঠিক করতে লাগলাম কীভাবে সব সামাল দেব। সাধারণ অবস্থায় পড়লে আমি কাঠ বাছাই করার নিয়ম উল্লেখ করতাম আর ওই ঠাক পরিদর্শককে অবশ্যই বোঝাতে চাইতাম কাঠ ঠিক আছে আর তার মান ঠিক, এটা তাঁরই ভুল হচ্ছে। তিনি ভুল নিয়ম প্রয়োগ করছেন। অবশ্য আমি ঠিক করলাম এই শিক্ষায় যে নিয়ম শিখেছি তাই কাজে লাগাব।

কারখানার কাছে যখন পৌঁছলাম, তখন সেই ভদ্রলোক আর কাঠ পরিদর্শক বেশ বদমেজাজেই তৈরি হয়ে আছেন, লড়াই করতে তারা প্রস্তুত। আমরা এবার যে গাড়ি

থেকে কাঠ নামানো হচ্ছিল সেখানে গোম। আমি তাঁদের অনুরোধ করলাম সব কাঠ নামাতে দেয়া হোক যাতে ব্যাপারটা বুঝতে পারি। পরিদর্শককে আমি এও বললাম তিনি বাতিল কাঠগুলো এক জায়গায় আর ভালোগুলো অন্য জায়গায় রাখুন।

'বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করেই বুঝলাম পরিদর্শক ভদ্রলোক বড় বেশি রকম কড়া আর বাছাই করার নিয়ম তিনি মানছেন না। এই কাঠগুলো ছিল বিশেষ জাতের সাদা পাইন কাঠ–আমি এও বুঝলাম পরিদর্শক শক্ত কাঠ সম্পর্কে বেশ শিক্ষা পেয়েছেন বটে তবে সাদা পাইন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। সাদা কাঠে আমার অভিজ্ঞতা দারুণ এটা আমার বিষয়–তা বলে কি তিনি যেভাবে সব বাছাই করছিলেন তাতে আপত্তি করলাম? মোটেই না। আমি শুধু সব দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে দুচারটে প্রশ্ন করতে লাগলাম 'কোনো কাঠ কেন খারাপ-একবারের জন্যেও আমি বলি নি পরিদর্শক মশাই ভুল করছেন। আমি কেভল বোঝাতে চাইলাম আমার জানার উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে পাঠানোর সময় যাতে তাদের পছন্দসই কাঠ পাঠাতে পারি।'

বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পথে আর সহযোগিতার ভঙ্গিতেই আমি বারবার বললাম, তাদের কাজে লাগবে না এমন কাঠ তারা অবশ্যই সরিয়ে নেবেন। কথাবার্তায় মাঝখানে ভদ্রলোককে বেশ মোলায়েম করে তুলোম আর আমাদের মধ্যেকার তিক্তভাব অনেকটাই কেটে গেল। আমার সতর্ক কয়েকটা উক্তিতে ভদ্রলোক বুঝলেন বাতিল কাঠগুলোর কিছু হয়তো সত্যিই ঠিক আছে আর আসলে তাদের দরকার আরো দামি কিছু। আমি সতর্ক ছিলাম যাতে তিনি না ভাবেন আমি এ নিয়ে কোনো কথা তুলছি।

আস্তে আস্তে তাঁর সমস্ত ভাবভঙ্গিই বদলে গেল। তিনি শেষ অবধি আমার কাছে স্বীকার করলেন সাদা পাইন কাঠ সম্বন্ধে তার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। গাড়ি থেকে তা নামানোর সময় তিনি আমাকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি তখন ব্যাখ্যা করলাম এ কাঠ কেন পাঠানো হয়েছে, অবশ্য তার পছন্দ না হলে ফেরত নেব। শেষপর্যন্ত ভদ্রলোকের এমন অবস্থা হল যে যতবার কাঠ বাতিলের সারিতে রাখা হচ্ছিল, তিনি নিজেকে দোষী ভাবছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি বুঝছিলেন ভুলটা তাঁদেরই হয়েছে যেরকম ধরনের কাঠ দরকার ছিল যে ধরনের কাঠের অর্ডার তাঁরা দেন নি।

অবশেষ যা দাঁড়াল, আমি বিদায় নেবার পর পরিদর্শক গাড়ি বোঝাই সব কাঠ আবার যাচাই করলেন আর সবটাই নিয়ে নিলেন আর আমরাও পুরো টাকার চেক পেয়ে গেলাম।

এই একটা ব্যাপারেই সামান্য একটু কৌশলে কাজ হয়ে গেল। যেহেতু আমি কোনোভাবেই অন্যজনকে বলি নি তিনি ভুল করছেন, আর এতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দেড়শ ডলার নগদে লাভ হল। অবশ্যই টাকার বিনিময়ে আমাদের যে সুনাম নষ্ট হত তার মূল্যায়ন হয় না।'

একটা কথা এবার বলতে চাই, এ পরিচ্ছেদে নতুন কিছু আমি বলছি না। ঊনিশ শতক আগে যীশু বলেছিলেন : 'তোমার শত্রুর সঙ্গে চট করে একমত হও।

অন্য কথায় বলতে গেল আপনার মক্কেল, স্বামী বা শত্রুর সঙ্গে তর্ক করবেন না। কখনো বলবেন না তাঁর ভুল হচ্ছে, তাঁকে চটকে দেবেন না। বরং একটু কুটনীতি কাজে লাগান।

আর খ্রিস্টের জন্মের ২,২০০ বছর আগে মিশরের বৃদ্ধ রাজা আখখাঁটি তার ছেলেকে কিছু সুন্দর উপদেশ দিয়েছিলেন–যে উপদেশ আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজন। চার হাজার বছর আগে বৃদ্ধ রাজা আখখাঁটি মদ পান করার ফাঁকে তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন : কৌশলী হও। এতে তোমার সুবিধা হবে।

অতএব, অন্যকে স্বমতে আনতে হলে দু নম্বর নিয়ম হল :

'অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। কখনো তাকে বলবেন না–সে ভুল করছে।'

১৪. চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সচেষ্ট হোন

আপনার যুদ্ধংদেহী রুক্ষ ব্যবহার আপনাকে হয়তো আত্মপ্রকাশের তৃপ্তি দেবে, কিন্তু অপর পক্ষ তাতে রীতিমত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হতে পারে। এ কথা আপনার ভালোভাবে বোঝা দরকার।

একজন সমালোচক এ বিষয়টিকে আরো সরল করে দিয়েছেন-তার মতে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে যদি ঠাণ্ডা মাথায় ও সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলা যায় তাহলে উভয় পক্ষ সহজেই তাদের ভুল সংশোধন করে নেবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। কারণ, উত্তেজিত মাথায় কোনা সমস্যার সুচিন্তিত সমাধানের পথ পাওয়া যায় না। অযথা গণ্ডগোলে পণ্ড হয়ে যায় অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কাজ।

আমেরিকার এক জ্বালানী কোম্পানির শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর মালিক ম্যাকর্বন এই সত্যটিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

বেশি বেতনের আন্দোলনে শামিল শ্রমিকদের যুক্তিযুক্ত ধৈর্যশীল কথায় শান্ত করার দিকে না গিয়ে তিনি ব্যাপারটিকে 'শ্রমিক পক্ষ' 'মালিক পক্ষে'র মধ্যে এক জেদাজেদীর সৃষ্টি করেছিলেন বলে ধর্মঘট, গুলিগোলা, রক্তপাত, অজস্র ক্ষতি হল। এবার ম্যাকবর্ন বুঝলেন যে, বিষয়টাকে এভাবে শত্রুমনোভাবাপন্ন দৃষ্টিতে না দেখে শ্রমিকদের সঙ্গে একটা মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করাই ভালো হবে।

এ চেতনার জাগরণে তিনি শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা বৈঠকে এলেন। ম্যাকবর্ন তাদের মতামত ও স্পর্শকাতরতা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এমন সহানুভূতির সঙ্গে কথা বললেন যে শ্রমিকরা খুশি হলেন। তাদের আলোচনায় একদিকে যেমন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা পেল তেমনি রক্ষা পেল কোম্পানির স্বার্থ। একরোখা হয়ে লড়াকু হয়ে যাওয়া অসন্তুষ্ট শ্রমিকেরা তাদের এতদিনকার যন্ত্রচালিত সংগ্রামটির থেকে বিরত হলেন। ম্যাকবর্নকেও তারা তার সহমর্মিতার জন্যে প্রচুর প্রশংসা করলেন।

আসলে ম্যাকবর্নের সহৃদয় কথাগুলি সংগ্রাম জর্জর মৃতপ্রায় শ্রমিকদের কাছে ওষুধের কাজ করেছিল। তাঁর কথায় এমন এক সুধা ছিল যা ওই বিদ্রোহীদের কাছে টেনে আনতে পেরেছিল তার স্বপক্ষে।

বলুন তো কি বলেছিলেন ম্যাকবর্ন ওই ভীষণভাবে বিদ্রোহী শ্রমিক শ্রেণীর কাছে?

ম্যাকবর্ন বলেছিলেন–তিনি ওই বিরাট কোম্পানির অধিকর্তা, তিনি তাঁর শ্রমিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে পেরে গর্বিত।

মাত্র দুসপ্তাহ আগেও ম্যাকবর্ন তার শ্রমিকদের ভালোভাবে চিনতেন না। তিনি সাদার্ন কোলফিল্ড পরিদর্শন করার সময় সেই শ্রমিকদের পুরো পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁর অহঙ্কারহীন বিনীত ব্যবহারে অচিরেই ওই বিদ্রোহী শ্রমিকেরা আর পরিবারের সকলে তার গুণমুগ্ধ হয়ে গেল। ম্যাকবর্ন লাভ করলেন তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা। তিনি বক্তৃতায় আরো বললেন–যদিও আমি মালিক পক্ষের প্রতিভূ তথাপি আমি আপনাদের অনুগ্রহভাজন হতে পেরে ধন্য হলাম।

বলুন তো শত্রুকে বন্ধু করে তোলার কী সুন্দর এই কৌশলটি।

মনে রাখতে হবে, নিজের মতামত সুষ্ঠুভাবে করাতে চাইলে গায়ে জোর ফলালেই হয় না, কারণ মানুষ সহজে তার নিজের মত থেকে সরে আসতে চায় না। তাই বন্ধুর মতো ব্যবহার করে তাকে জয় করুন, আর আত্ম-গৌরবকে আহত না করে তাকে কাছে ট্রেনে নিন। একশ বছর আগে একথাই বলে গেছেন লিঙ্কন–যে কোনো মানুষের ওপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে হলে সহৃদয় ব্যবহার মধুর মতোই মিষ্টি হয় উঠবে।

ফোর্ড মোটর কোম্পানির শ্রমিকেরা যখন বিদ্রোহ করেছিলেন মাইনে বাড়াবার দাবিতে, তখন জেকব নামে এক ব্যক্তি তাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করে চনমনে হয়ে উঠবার জন্যে তাদের বেসবল খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর এর জন্যে তিনি নাকি একটা খেলার মাঠও ভাড়া করে ফেলেছিলেন!

প্রেসিডেন্ট জেকব এভাবেই আন্দোলনকারী শ্রমিকদের মন থেকে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করে তাদের বন্ধু হিসেবে কাছে পেয়েছিলেন। তারা তাঁর ব্যভহারে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে মাইনে বাড়াবার দাবি মুলতবি রেখে কোম্পানির ওয়ার্কশপের জঞ্জাল পরিষ্কার করে ঝকঝকে করে তুললেন। খুব শীঘ্রই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকের এই শত্রুতার নিরসন হল, তার বদলে প্রতিষ্ঠা পেল এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত। আমেরিকার বিপুল শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি আর কখনো দেখা যায় নি।

সুদক্ষ বক্তা ও তার্কিক সৌম্যদর্শন ব্যারিস্টার জোনস্ লিঙ্কনের বন্ধুত্ব লাভ করতে পেরেছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ার চার্লি স্ট্রেনার তার মেয়াদ শেষ হওয়া ইজারা নেয়ার বাড়িটিতে আরো কিছু দিন থেকে যেতে চায়। অথচ তিনি ভালো ভাবেই জানতেন মালিক ভদ্রলোক বেশ কড়া ধাতের মানুষ। নিছক আবেদন-উপরোধে তার মন গলানো অসম্ভব। অতঃপর তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ তার মূল্যবান জ্ঞানটিকে কাজে লাগালেন। মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি মেয়াদ বাড়াবার কথা মোটেও বললেন না। উষ্ণ অভিবাদন জানানোর পরে তিনি মালিককে বললেন–কী সুন্দর ছিল বাড়িটাতে থাকবার দিন কটি। বাড়িটি এত সুন্দর যে, সত্যিই আপনার রুচি পছন্দকে তারিফ করতে হয়। আরো কিছুকাল থাকার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু কি করে আর থাকি!

ওঁর আন্তরিক প্রশংসা ও মধুর বাক্যে বাড়িওয়ালা এত প্রীত হলেন যে, চার্লিকে আরো কিছুদিন থেকে যাবার অনুমতি দিলেন, এমনকি বর্ধিত ভাড়াও নিলেন না।

চার্লি আসলে মালিককে অন্য ভাড়াটেদের মতো পেশাদারী কথা না বলে তাঁর মনটিকে ছুঁতে চেষ্টা করেছিলেন–ফলে জয় তার হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল।

এবার অন্য প্রসঙ্গে বলি, মিসেস এমিলি একবার একটি হোটেলে মধ্যাহ্নকালীন ভোজের আয়োজন করেছিলেন তার বান্ধবীদের নিয়ে। আমিও সেখানে ছিলাম আমন্ত্রিত। গল্পগুজব ইত্যাদির পর আমরা কয়েকজন আহারে বসলাম। খাবারের ব্যবস্থা ভালোই ছিল। কিন্তু বাদ সাধল তার বেয়ারটি। সে সম্মানীর অতিথির খাদ্য পরিবেশন করবার

শিল্পটি বলতে গেলে জানেই না। আমার তখন বদরাগী স্বভাব ছিল। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের আগে আমি মানুষের এ ধরনের ব্যবহারের একটি সঙ্গত কারণ থাকে এই বিষয়টির ওপর একটা বক্তৃতা শুনেছিলাম। তাই বেয়ারটিকে তিরস্কার বা ভৎর্সনা কিছুই না করে আম এমিলির কাছে ঘেলাম। তাকে বললাম বেশ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে–দেখ এমিলি, আমি জানি এ ব্যাপারে তোমার কোনো ত্রুটি নেই, আসলে কি জানো তোমার বেয়ারটি বদ্ধ কালা।

সরাসরি এমিলির ব্যবস্থাকে অভিযোগ না করায় এমিলি কৃতজ্ঞ হল আমার ওপর! বাকি পার্টিটা সে এত সুন্দরভাবে অতিথিদের যত্ন করল যেন মনে হল কুইন মেরিক ওই পার্টিতে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে! এমিলির বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে আমি সেদিন মুগ্ধ হয় গেলাম।

ছেলেবেলার একটা গল্প এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার।

বাতাস এবং সূর্য একদা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে রত হল কার গুরুত্ব বেশি তাই নিয়ে। তারা নিজেরাই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে উদ্যোগী হল। এক পথিক রৌদ্রোজ্জ্বল পথে চলছিল। সূর্য আর বাতাস বললে–ওই পথিকের কোটটিকে যে ভোলাতে পারবে সেই আমাদের মধ্যে হবে সেরা।

সূর্য মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। বাতাস বেগে বইতে শুরু করে দিল। ফলে পথিক শীতাত হয়ে গায়ের কোটটা ততই জড়িয়ে ধরতে লাগল। তারপর বাতাস শান্ত হল। এবার সূর্য প্রবলভাবে কিরণ ছড়াতে লাগল, প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ট হয়ে এবার পথিক তার

গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। সূর্যই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল নিজের। তার পর বাতাসকে ডেকে বলল-ভদ্রতা, বন্ধুত্ব ও উষ্ণতা সর্বদাই শক্তিমান থাকে জোরজবরদস্তির চেয়ে।

যিশুর জন্মের একশ বছর আগে রোমান কবি পাবলিয়ার্শ সাইরাম বলে গেছেন-যখন অন্যের প্রতি আমার অনুরাগ হবে তখন আমরাও তাদের প্রতি অনুরক্ত হতে পারব।

একটা কথা সর্বদাই মনে রাখবেন, জনপ্রিয়তা বাড়াবার একমাত্র উপায় হল নিজেকে নিমেষে অন্যের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা।

আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আশা করি, আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ তাদের প্রতিদিনকার জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তাঁরাও হয়তো তাদের সুখী জীবনের সার্থক ও সুন্দর চিত্র লেখায় ফুটিয়ে তুলবেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে। আর এখানেই এই লেখার চরম সার্থকতা।